অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধানাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পরিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

ষষ্ঠ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

ষষ্ঠ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী-১০

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা (মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" ঃ হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ষষ্ঠ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫ ও ১৩৬৬ সালের "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার ষষ্ঠ খণ্ড। কাজের প্রায়োজনে একই পত্রের অনুলিপি বহুস্থানে পাঠাইতে হইত বলিয়া প্রধানতঃ অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি— বিজয়া দশমী, ১৩৬৬

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী।

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ।

প্রকাশক

ধৃতং প্রেম্না

(ষষ্ঠ খণ্ড)

(১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২৩শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার নামে একটি অভিযোগ আসিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, লোকেরা সমবেত উপাসনায় বসিয়া যাইবার পর, উপাসনা আরম্ভ হইয়া গেলে, তুমি লোককে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য কর। অভিযোগ এই যে, ইহাতে উপাসকদের ভাব নষ্ট হয়। আমার মনে হয় কথাটা অযৌক্তিক নহে।

আমাদের সমবেত উপাসনায় ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদাভেদ নাই। ব্রাহ্মণের ছেলেরা আগে বসিবে আর শূদ্রের ছেলেরা পরে বসিবে, ইহা আমাদের প্রথা নহে। তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভের পথ সকলকে

আমরা দিয়াছি। ব্রহ্মণত্বই আমাদের দৃষ্টিতে আদর্শ অবস্থা। সত্যপরায়ণতা, সততা, ইন্দ্রিয়-সংযম, দৈহিক ও আত্মিক শুদ্ধি, পরহিত-বুদ্ধি ও নিষ্কামতা ব্রাহ্মণের গুণ। এই গুণগুলি অর্জ্জন করিয়া অন্য জাতির পুত্র-কণ্যারা ব্রাহ্মণ হউক, ইহাই ত' আমাদের কাম্য। সকলকে শূদ্রত্ব হইতে টানিয়া তুলিয়া ব্রাহ্মণ্যতেজে মণ্ডিত করিব, ইহাই ত' আমাদের লক্ষ্য। কে কোন্ জাতির পুত্র বা কন্যা, উপাসনায় বসিয়া সেই বিচারে আসনের পরিবর্ত্তন-সাধন সঙ্গত নহে।

তবে, তোমাদের একটা অসুবিধা আমি বুঝি। সমবেত উপাসনাতে উদারবুদ্ধি ব্রাহ্মণ-সন্তান দু' দশজন আসিয়া থাকেন। অব্রাহ্মণ সন্তান-দেরই সংখ্যা বেশী। অখণ্ড-দীক্ষা এই অব্রাহ্মণ-সন্তানদিগকে যে কৌলীন্য দিয়াছে, তাহার গর্ব্বে ইহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ-সন্তানদের প্রতি অকারণ দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকে। বিনয় যে ব্রাহ্মণের গুণ, ইহা বিস্মৃত হইয়া ইহারা বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের ঈর্ষ্যা আর শূদ্রের জুগুপ্সা নিজেদের অঙ্গের ভূষণ করিয়া রাখে। অর্থাৎ ইহারা অখণ্ড-দীক্ষা দ্বারা কেবল বামনালির বড়াইটাই অর্জ্জন করিয়াছে,—ব্রাহ্মণের বিনয় আয়ত্ত করিতে ইহারা আগ্রহী নহে। এই কারণেই কোনও কোনও সমবেত উপাসনার ক্ষেত্রে ইহারা ইচ্ছা করিয়াই ব্রাহ্মণ-সন্তানদিগকে অবমাননা করিয়া থাকে। তোমরা যে কয়জন ব্রাহ্মণ-সন্তান অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছ, তাহাদের বহুদূর-বিতাড়িত জাত্যভিমান এই সকল কারণে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে চাহে। আমি তোমাদের অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়াছি।

কিন্তু এই সকলে বিচলিত না হইয়া তোমাদের কর্ত্তব্য হইবে শূদ্র-সন্তানগণের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত সদাচারগুলি শিক্ষা দেওয়া। নিজেদের জীবনেও ব্রাহ্মণিক সদাচার ও সুরুচিকে দৃঢ়তর-নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত। শঙ্করচার্য্য, চৈতন্যদেব, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ, ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, বিশুদ্ধানন্দ, লোকনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, জগদ্বন্ধু প্রভৃতি ব্রহ্মদর্শী ঈশ্বরকল্প পুরুষেরা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহারা জগৎ-পূজ্য হন নাই। আর ব্রাহ্মণবংশজাত এই সকল মহাপুরুষেরা জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণেরা সকলের পূজনীয় হন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মণ-সন্তানদের ভিতরেও সাধারণতঃ কতকগুলি সদাচার এই সেই দিন পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে। তোমরা অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরে কেন সেই সকল সদাচারের অনুশীলনে প্রয়ত্নপর হইবে না? সমগ্র জাতি, দেশ ও পৃথিবী একটা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছে। এই সময়ে ছোটদের রোষহীনতা এবং বড়দের অদোষদৃষ্টি যুগপৎ প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণ-সন্তান আর শূদ্র-সন্তানের ব্যাপার ছাড়িয়াই দাও। অনেক সময়ে নেতৃস্থানীয় অখণ্ডগণ মানুষ ঠেলিয়া পিছনে হঠাইয়া উপাসনার স্থানে অগ্রে আসন পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। উপাসনা আরম্ভ হইবার পরে এইরূপ চেষ্টা অন্যায়। সুরজ্ঞদের জন্য সামনের দিকে কিছু আসন রাখিয়া উপাসনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। তদ্রূপ স্থলে বিলম্বে আগত সুরজ্ঞেরা সেই শূন্য আসনে বসিতে পারেন। কিন্তু ইহা যেখানে সম্ভব হয় না, সেখানে সুরজ্ঞেরা বিলম্বে আসিলে

পিছনেই বসিবেন। উপাসনা আরম্ভ হইবার পরে আগে যাইবার জন্য ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি অত্যন্ত আপত্তিজনক। যেখানে আগে যাইবার মত সঙ্গত রাস্তা নাই, সেখানে সামনে আসন শূন্য থাকিলেও কাহারও যাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে। অর্থাৎ উপাসনাটি আরম্ভ হইয়া যাইবার পরে উপাসনার গাম্ভীর্য্য নাশ করা কাহারও উচিত নহে। উপযুক্ত রাস্তা না থাকার দরুণ আমি নিজেও অনেক সময়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়া থাকি। আমাকে সর্ব্বদাই সাধ্যাতীত কর্ম্মতালিকার বোঝা বহিয়া বেড়াইতে হয়। তাহার উপরেও অনেক সময়ে অবুঝ ভক্তেরা নূতন নূতন কর্ম্মতালিকা অননুমোদিত ভাবেই চাপাইয়া দেন। ফলে, শ্যাম রাখিতে গেলে কূল থাকে না। উপাসনা-স্থানে যাইয়া অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, আমার জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে আসনখানা ঠিকই পাতা আছে কিন্তু আমার যাইবার রাস্তাটুকু নাই। এমনও দেখিয়াছি যে, উপাসনা আরম্ভ হইবার আগেই রাস্তা জাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নির্দ্ধারিত সময়ের দু-চার মিনিট আগে আসিয়াও আমাকে রাস্তার আশায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে, নতুবা পিছনেই একস্থানে বসিয়া পড়িতে হইয়াছে। উদ্যোক্তাদের শৃঙ্খলাজ্ঞান থাকিলে এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপযুক্ত চেষ্টা থাকিলে এই সকল অবাঞ্ছনীয় অবস্থা ঘটিতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২৩শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমবেত উপাসনার মতন নির্দ্দোষ অনুষ্ঠানের মধ্যে মতভেদ, ঝগড়া-কলহ প্রভৃতি একেবারেই অকল্পনীয়। বুঝিবার ভুলেই এই সকল হইয়া থাকে। উপাসনার প্রতি আস্থাবান ব্যক্তিরা গুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন না, করিবেন নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। আমাদের সমবেত উপাসনায় পণ্ডিত বা মূর্খের বিচার নাই, ধনী বা দরিদ্রের তারতম্য নাই, উচ্চ বা নীচের বিতর্ক নাই। ভক্তিভরে শুচিশুদ্ধভাবে যাহার ইচ্ছা সে আস, উপাসনা করিয়া মনকে শান্ত কর, স্নিগ্ধ কর, তারপরে বিনা কোলাহলে ঘরে ফির। উপাসনা-কালে তোমরা মনকে নির্বৈর, নিরাকাঙ্ক্ষ, নিঃস্পৃহ ও অনাসক্ত রাখিও। উপাসনার মণ্ডপে আইন, আদালত, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঢুকাইয়া অশান্তির চাষ করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৩শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বৃদ্ধ বয়সে সকলেরই আদর কমিয়া যায়। সুতরাং সংসারে তোমার আদর কমিয়া গিয়াছে, ইহাতে দুঃখিত হইও না। পুত্র-পরিজন তোমার সহিত যে ব্যবহারই করুক, তুমি নামে লাগিয়া থাক। বৃদ্ধকালে তোমার ইন্দ্রিয়গণই বশে নাই আর পুত্রকন্যাগণ তোমার বশে থাকিবে? পুত্রদের প্রতি কোন বিরক্তি পোষণ করিও না। ক্ষমাসুন্দর চক্ষে তাহাদের প্রতি তাকাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৩শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শিক্ষক হইয়া ছাত্রীর পাণি-পীড়ন ভারতীয় দৃষ্টিতে পীড়াদায়ক। অর্জ্জুন উত্তরার পাণিগ্রহণ না করিয়া নিজ পুত্র অভিমন্যুর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। নৃত্যের মতন বিদ্যা শিখাইতে গিয়া গুরু এবং শিষ্যার প্রণয় খুব

স্বাভাবিক। কেননা, নৃত্যে লাস্যলীলা এবং শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা বিভঙ্গিমার প্রয়োজন হয়। উহাদের অধিকাংশই কামোদ্দীপক আর পুরুষের অন্তরের সুপ্ত পশুটাকে খোঁচাইয়া জাগাইয়া তুলিবার জন্যই নারী-নৃত্যের সৃষ্টি। তদবস্থায়ও অর্জ্জুন শিষ্যাকে বিবাহ করেন নাই। পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিয়াছিলেন।

শ্রীমান্ য—ত' তাহার ছাত্রীটীকে ক-খ-গ-ঘ A B C D পড়ায়। স্কুলপাঠ্য এই সকল পুস্তকের মধ্যে কামকলা নাই। তবু যদি সে এই মেয়েটিকে বিবাহ করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মাষ্টারটির মাথায় গোলমাল হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ অনুমোদন না করিয়া শিক্ষকটির চিকিৎসা অনুমোদন করা উচিত।

অমুককে বিবাহ না করিলে আমার প্রাণ থাকিবে না, এই সকল চীৎকার যাহারা করে, তাহাদের শতকরা নব্বই জন বদ্ধ উন্মাদ। অভিলষিত ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিবার পরে ইহারা পুনরায় নূতন প্রণয়িণী খোঁজে। এই প্রণয়-ব্যাধির মূলকারণ মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা। ছোক্‌রাকে ভাল করিয়া খাইতে দাইতে বলিও, ডন-কুস্তি করিতে বলিও, দিন পাঁচ মাইল করিয়া পথ-পর্য্যটন করিতে বলিও। নিয়মিত এক মাস এই নিয়ম-পালন করিবার পরে তাহার ব্যাধি চৌদ্দ আনা কমিয়া যাইবে। এই জাতীয় প্রেম-কাতরতাকে প্রশ্রয় দিলে তাহা কেবলই বাড়িতে থাকে। ইহাকে পুরুষের হিষ্টিরিয়া নাম দিতে পার।

শ্রীমান্ বয়সেও তরুণ। তাহার একটি বিবাহিতা পত্নী আছেন। দুটী সন্তানও হইয়াছে। তরুণ স্বামী তরুণী পত্নীর প্রতি অনুরক্ত না

থাকিয়া একটি বারো তেরো বৎসর বয়স্কা ছাত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া পাগ্‌লামী করিবে, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। ছাত্রীর অভিভাবকেরাই বা এইরূপ একটা বিবাহ-প্রস্তাব কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন? যে সময়ে হিন্দুমাত্রের পক্ষে একাধিক বিবাহ আইনতঃ দণ্ডনীয়, সেই সময়ে তুমিই বা এমন একটা বিবাহে সুপারিশ কি করিয়া করিতেছ?

প্রকৃত প্রেম গাছে ফলে না। শুদ্ধ আধারেই শুদ্ধ প্রেম জন্মে। নরনারীর প্রেমও অত্যন্ত উন্নত স্তরের হইতে পারে, যদি পশ্চাতে থাকে শুভ সাধনা। শ্রীমান্ য—কে সাধক হইতে বল। উপযুক্ত স্থান হইতেই সে সাধন পাইয়াছিল কিন্তু কাজ কিছুই করে নাই। তাই আজ তাহার মত ছেলের পচা শামুকে পা কাটিতে চলিয়াছে। এতকাল সাধন করে নাই বলিয়াই নর্দ্দমার নোংরা জলকে গঙ্গোদক বলিয়া পান করিতে সে চাহিতেছে। তাহার এই অপচেষ্টায় প্রশ্রয় না দিয়া প্রকৃত বন্ধুর মতন বাধা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৬শে আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। প্রতিটি অক্ষর যেন

সুধাক্ষরণ করিতেছে। এত প্রেম, এত ভালবাসা যার, তাহাকে ভাল না বাসিয়া কে থাকিতে পারে? তোমরা তোমাদের এই প্রেম-মাধুর্য্য দিয়া আমার প্রাণেরও অধিক প্রিয় হইয়াছ।

সর্ব্বদা নামে লাগিয়া থাক। একটী নিমেষের জন্যও তাঁর নাম ভুলিও না। জাগ্রতে, নিদ্রায়, কর্ম্মে, বিশ্রামে, সুখে ও অসুখে সর্ব্বাবস্থায় নামকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ কর। যতক্ষণ তাঁর নাম স্মরণে রাখিলে, ততক্ষণই তুমি জীবিত, এই বিশ্বাস রাখিও। যেই মুহূর্ত্তে নাম বিস্মৃত হইলে, তোমাতে আর মৃত ব্যক্তিতে পার্থক্য নাই। নিত্য জীবন লাভ করিতে হইলে ভগবানের নামকে নিত্য স্মৃতিতে এবং নিজেকে ভগবানের নামে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

যাঁহারা ভগবন্নামের সেবা করিতে ভালবাসেন, আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিবে। যাহারা ঈশ্বরের নামে অবিশ্বাসী, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিবে। সঙ্গগুণে বা সঙ্গদোষে মানুষের অজ্ঞাতে অনেক সম্পদ লাভ হয়, অনেক ঐশ্বর্য্য খোয়া যায়। তুমি বিশ্বেশ্বরের সন্তান, তোমার ভিতরে কত ঐশ্বর্য্য, কত মাধুর্য্য, কত গৌরব, কত মহত্ত্ব লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহা এখন তুমি জান না। প্রকৃত সৎসঙ্গ করিতে করিতে ভিতরের সম্পদ বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইবে, তোমার ঐশ্বর্য্য তোমার কাছে ধরা দিবে। এই জন্যই সৎসঙ্গের দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখিতে হয়।

সন্দিগ্ধচেতা, অবিশ্বাসী ও ভগবন্নিন্দকের সঙ্গ কখনও করিবে

না। চারিদিকে যদি মনের মত সৎসঙ্গী না পাও, তাহা হইলে নিজের চেষ্টায় নিজের পরিজনগণকে সৎসঙ্গ-দানক্ষম মহৎ লোকে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইবে। জগতে সম্প্রদায়-সৃষ্টি কি ভাবে হইয়াছিল, জানো? প্রকৃত সাধু ব্যক্তিরা সাম্প্রদায়িক ভাবকে ঘৃণা করেন, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে তাঁহাদের ভগবৎ-সেবার বিঘ্ন বলিয়া মনে করেন, সাম্প্রদায়িক অন্ধত্বকে মানুষ্যত্বের অবমাননা-জনক বলিয়া জ্ঞান করেন। তবু প্রকৃত ধার্ম্মিকদের দ্বারাই সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, প্রকৃত ধার্ম্মিকেরাই উপদেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সম্প্রদায়ী না হইলে সাধন হয় না। ইহার অর্থ এই যে, নিজের সাধন-রুচিকে অব্যাহত ও গভীর রাখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে নিজের ভাবের ভাবুকের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রয়োজন। ইহা একটা অত্যাবশ্যক ব্যাপার। অথচ বুঝিবার ভুলে মানুষেরা নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত কতকগুলি গোঁড়া অন্ধেরই সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাদের সঙ্গ হইতে নিভৃত নীরব গভীর নিবিড় একান্ত একাগ্র সাধনের কোনও রুচিই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। করিয়াছে চিল্লাচিল্লী আর হুড়াহুড়ি আর তাহারই নাম দিয়াছে মহোৎসব বা ইষ্টগোষ্ঠী।

এই দিকে তোমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নিজের সাধনের অনুকূল ভাবুক সংগ্রহ ও তৈরী করিয়া নেওয়া তোমাদর কর্ত্তব্য হইবে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা-রূপিণী পিশাচী আসিয়া মানুষে মানুষে, সঙ্ঘে সঙ্ঘে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে বিরোধ, বিদ্বেষ, অশান্তি সৃষ্টি না করিতে পারে, তাহার দিকে তাকাইয়া চলিতে হইবে। যে সম্প্রদায়ের জন্ম অন্য সম্প্রদায়কে আঘাত দিবার

জন্য, সেই সম্প্রদায়ে থাকিয়া সৎসঙ্গ পাওয়ার কল্পনা অত্যধিক দুরাশা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ কলিকাতা
২৬শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। সকল গ্রহ-নক্ষত্রকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারই পরম অভয় নামে তুমি দীক্ষিত। তোমার আবার গ্রহপূজার প্রয়োজন কি? তুমি সমবেত উপাসনার দ্বারা তোমার পুত্রের সকল বিঘ্ন নাশ কর। আমি তোমার গুরু। গুরুর বাক্য পাইবার পরে অন্য লোকে কি কহিল না কহিল, তাহা বিচারের আবশ্যকতা কোথায়?

একদিন ছিল, যখন গ্রহণক্ষত্রগণেরও প্রভু পরমেশ্বরকে মানুষ নির্ভুল ভাবে চিনিতে পারে নাই। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব যে সীমাবদ্ধ, তাহা মানুষ জানিত কিন্তু যিনি অসীম, তাঁহার পায় নাই পরিচয়। সেদিন গ্রহনক্ষত্রের পূজার প্রচলন হইয়াছিল। আজ মানুষ সকলের পরম-প্রভুকে চিনিয়াছে। আজও গ্রহাচার্য্যদের ভীতি-প্রদর্শনে আতুর হইয়া তাহাই করিয়া যাইতে হইবে, ইহার যুক্তি আমি বুঝি না।

তোমরা শাখা ছাড়িয়া মূল ধর। বৃথা তোমাদের অন্তরের ভক্তিভাবকে নানা দিকে ছড়াইয়া দুর্ব্বল করিও না।

তোমার একটী গুরুভগিনী তোমারই ন্যায় সহজ সারল্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, তাহার কন্যার গায়ের উপরে একটী কাক আসিয়া বসিয়াছিল, ইহাতে সে বড়ই চিন্তিতা হইয়াছে এবং গ্রহাচার্য্যের উপদেশ চাহিয়াছে। গ্রহাচার্য্য মহাশয় তাহাকে কয়েকটী গ্রহপূজা করিবার উপদেশ দিয়া বাজারের একটী সুদীর্ঘ ফর্দ্দ তৈরী করিয়া দিয়াছেন।

আর একজনের গৃহের মধ্যে রাত্রি কালে একটী শাদা পেচক প্রবেশ করিয়াছিল। তৃতীয় একজনের ঘরের চালে শকুনী বসিয়াছিল। চতুর্থ একজনের গৃহে বিড়ালে কাঁদিয়াছিল। ইহারাও সকলে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া গ্রহাচার্য্যের শরণাপন্ন হয় এবং সেখানে ইহারা ঐ একই রকমের প্রতীকারোপদেশ পায়। কিন্তু এই যুগের মানুষ গ্রহ তৈরী করিয়া অনন্ত শূন্যে নিক্ষেপ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। কিছুকাল পরে হয়ত শুনিতে হইবে যে মঙ্গলগ্রহে একদা এত উন্নত শ্রেণীর মানবজাতি ছিলেন, যাঁহারা নকল গ্রহ উপগ্রহ তৈরী করিয়া অনন্ত শূন্যে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল অন্তঃসারহীন শূন্যগর্ভ গ্রহ কয়েক লক্ষ বছর ধরিয়া মহাশূন্যেই ভ্রমিয়া বেড়াইতেছে এবং আজও তাহারা নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। যেই যুগে ভূত-বিজ্ঞান এত উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই যুগে অমঙ্গল নাশের জন্য তোমরা বিশ্বস্রষ্টার শরণাপন্ন না হইয়া গ্রহ-নক্ষত্রের শরণাপন্ন কেন হইবে, ইহা দুর্ব্বোধ্য।

পরমেশ্বরে অনুরক্ত হও। সকল প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, আশা, প্রত্যাশা ঐ একজনেতে সংলগ্ন কর, ঐ একজনকে সমর্পণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২৬শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভিক্ষা করার চাইতে খাটিয়া খাওয়া ভাল। কায়েতের ছেলে যদি দোকানদারী করিতে পারে, তাহা হইলে ক্ষেত্রকর্ষণও করিতে পারে। কারণ, উভয়ই বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ত্তব্য। পরাধীন চাকুরী করার চাইতে স্বাধীন ভাবে হলচালনা করা শ্রেয়ঃ। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাও হলচালন করিতেন, তাহাতে প্রত্যবায় হইত না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২৬শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কেবল নামে মাত্র শিষ্য থাকিও না, কাজেও শিষ্য হইবার চেষ্টা করিও। যাহারা গুরুদেবের আদেশ পালনে যত্ন নিবে না, তাহাদের আবার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া কেন? চতুর্দ্দিকে কত কাজ রহিয়াছে। কত জন তোমার সেবা পাইবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। তোমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্যই আগে ইহাদের দিকে তোমার তাকান প্রয়োজন। এই বিষয়ে ক্ষীণ দৃষ্টি বা হীন বুদ্ধি কি প্রশংসার? পরম প্রেমভরে ইহাদের মধ্যে কাজে লাগিয়া যাও! ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ কলিকাতা
২৬শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিজেই ত' বহুদিকে প্রসারিত মনকে একদিকে আনিলে না। তোমার ছোট মেয়ে কেন উপাসনায় বসে না, ইহা নিয়া অনুযোগ অভিযোগ করিয়া আর কি লাভ হইবে? তোমার সন্তান চখের উপরে দেখিতেছে, তোমার ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া হাজার দেবতার প্রতীকের সাম্‌নে বসিয়া নিজেই তুমি দিশাহারা হইয়া যাও যে, কোন্ প্রতীকটীর প্রণাম আগে করিবে, কোন্ ছবিটীর পূজা আগে সারিবে। তোমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব তোমার কন্যাতে সাধনে অরুচি ও অনাস্থা সৃজন

করিয়াছে। সে যখন দেখিবে, তুমি সব ছাড়িয়া সব ভুলিয়া একটীকে নিয়া মজিয়াছ, তখন তাহার সাধন-রুচি আপনা-আপনি বাড়িবে। অবিশ্বাসী মাতা-পিতা বিশ্বাসী সন্তানের আত্মবিকাশের অনুকূল পরিবেশ দিতে পারে না মা।

অতি তরুণ বয়সে, কুমারী অবস্থায়, রোগশয্যায় পড়িয়া মৃত্যুর দিন গণিতে গণিতে, অলৌকিক ভাবে তুমি গুরুকৃপা পাইয়াছিলে। পূর্ণ পরিণত বয়সে একদিন হঠাৎ দেখিয়া অবাক্ হইলে যে, সেই গুরুই সেই মন্ত্র দিয়া তোমাকে প্রকাশ্যে দীক্ষা দিলেন। গুরুকৃপা তোমার গৃহে বৈজ্ঞানিকের কল্পনাতীত আশ্চর্য্য ঘটনাও ঘটাইয়াছে। তারপরেও যে তোমার একনিষ্ঠা আসে না মা, ইহা কাহার দোষ?

প্রেমভক্তির অভাব থাকিলে মানুষ তাহা বহুশব্দাবলি-সমৃদ্ধ বচন-চাতুরীর দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ইষ্টে ও মন্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে সে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তির দ্বারা ঠাকুরঘর সাজাইয়া রাখিয়া লোকের কাছে ভক্ত সাজিবার চেষ্টা করে। নিজের ভক্তির অভাব ও বিশ্বাসের অপ্রাচুর্য্য নিজের নিকটেই ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বিহ্বল হইয়া সে কখনো জয় নন্দীভৃঙ্গী বা জয় ময়ূর-পেচক-বৃষ-রাসভ বলিয়া চীৎকার করে।

তোমার অন্তরের দিকে তাকাইয়া দেখ, উপরে বর্ণিত চিত্রটী ঠিক তোমারই প্রতিচিত্র কিনা। নিজেকে এই দুরূহ সঙ্কট হইতে বাঁচাইতে হইলে প্রেমিক হও। প্রেম না আসিলে বহুনিষ্ঠা দূর হইবে না। তোমার বহুনিষ্ঠা দূর না হইলে তোমার কন্যাও দীক্ষালব্ধ সাধনে

মন দিবে না। তোমাতে যাহা দেখিতেছে, তোমার কন্যা প্রকারান্তরে তাহারই অনুকরণ করিতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৭শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। অসুখে পড়িয়া অবধি তুমি কেবলই চিন্তা করিতেছ যে, বিশ্ববাসী সকলের অসুখ তোমাতে আসিয়া পুঞ্জীভূত হউক আর সকলে তোমার অপরিসীম কষ্টস্বীকারের মধ্য দিয়া পূর্ণ আরোগ্য লাভ করুক। তোমার এই চিন্তা তোমার বিশ্বপ্রেমের এক জীবন্ত পরিচয়। যীশুখ্রীষ্ট নিজের উপরে বিশ্বের পাপ নিয়া বিশ্ববাসীকে পাপ হইতে মুক্তি দিলেন বলিয়া কথিত হয়। আর, এই কারণেই তাঁহাকে জগত্রাতা বলিয়া পূজা করা হয়। তুমিও বিশ্বের সকলের ব্যাধি নিজে নিতে চাহিয়াছ। বিশ্ববাসীর রোগমুক্তি এইভাবে চাহিয়াছ। তুমিও মহৎ, তুমিও পূজ্য।

কিন্তু বাবা, একটা কথা ভুলিও না। বিশ্বের প্রতি রোগী, প্রতি পাপী নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের ফলে রোগ ও দুঃখ ভোগে। যাহাতে তাহারা কুকার্য্য হইতে বিরত হয়, সৎকার্য্যে নিরত হয়, স্বার্থসেবা, লোভ ও ক্রোধাদি পরিহার করে, পরার্থসাধন, নিষ্কামতা ও চিত্তসংযম

অবলম্বন করে, তাহার জন্যও প্রার্থনা করিও। তাহার জন্যও তোমার চিন্তার শুদ্ধ শক্তিকে দিকে দিকে প্রেরণ করিও।

তোমার ন্যায় আমার প্রতিটি সন্তান হউক। তোমার ন্যায় হউক প্রতিটি বিশ্ববাসী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৭শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার মৌনব্রত ভঙ্গের পর হইতে তোমাদের মধ্যে যেন ব্রত-শিথিলতা দেখিতেছি। তোমরা কি সংযমকে শিথিল করিয়াছ? নতুবা তোমাদের সমুদ্যত কর্ম্ম-পৌরুষ হঠাৎ এমন দুর্ব্বল দেখা যাইতেছে কেন? কিছুদিন কাজ করিয়াই হঠাৎ ন্যাতাইয়া পড়িতেছ কেন? কেন তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় বেপরোয়া হইয়া কাজে লাগিয়া থাকিতে পারিতেছ না? যাহার ভিতরে যত অধিক উদ্যাম দেখিয়াছি, সেই কি তত অধিক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ?

অবশ্য, আমি নিরুৎসাহ করিতেছি না। আবার ব্রতধারী হও। আবার ব্রহ্মচর্য্য পালন সুরু কর। আবার অমিতবিক্রমে কাজ আরম্ভ কর।

ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা আমি তোমাদিগকে শতমুখে কহিতে চাহি।

দ্বিশত কর্ণে তোমরা তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য বলের উৎস, পৌরুষের উৎস, উদ্যমের উৎস, বীর্য্যের উৎস।

বীর্য্যবান্ না হইলে প্রেম আসে না। প্রকৃত প্রেমিক না হইলেও কেহ বীর্য্যবান্ হইতে পারে না। তোমরা বীর্য্যবান্ হও, প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আত্মকলহ বাড়ে কখন জানো? সঙ্ঘের যখন সম্প্রসারণ কমিয়া যায়। সঙ্ঘের বিস্তৃতির দিকে যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা নিজেদের মধ্যে কলহ করিবার অবকাশ পায় না। যে সকল দুর্ব্বলতা আত্মকলহ সৃষ্টি করে, সংঘের সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য ব্যাপক হইলে সেই সকল দুর্ব্বলতা কতক কতক আপনিই কমিয়া যায়। অবশ্য, প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং নৈতিক স্বচ্ছতা সাধনের চেষ্টা আসিলেও এই সকল দুর্ব্বলতা নাশ পায়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত কেবল গায়ের জোরে কেহ প্রেমিক হয় না। প্রেম সর্ব্বব্যাধির শান্তিকর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। বাগানে মাটী কোপাইতে কোপাইতে হঠাৎ কোদাল পাথরে ঠেকিল আর একটু নীচেই একটী সুদৃশ্য জিনিষ পাইলে। কেহ অনুমান করিলে ইহা অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, কেহ ধারণা করিলে ইহা বংশীবদন কৃষ্ণ। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তাহা মন্দিরে নিয়া বসাইলে আর পূজা করিতে আরম্ভ করিলে।

তোমাদের এই পাষাণ-প্রিয়তাকে পছন্দ করিতে পারিলাম না। যদি সত্যই কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তিই পাইয়া থাক, তবে তাহা ঐতিহাসিক গবেষণাকারীর হাতে সঁপিয়া দাও। তিনি গবেষণা করিয়া নির্দ্ধারণ করুণ যে, কোন্ যুগের ইহা মূর্ত্তি এবং সম্ভব হইলে তিনি ইহা হইতে দেশের লুপ্ত ইতিহাসের দুই এক অধ্যায় আবিষ্কার করুন। এই মূর্ত্তিকে ঘরে আনিয়া পূজার বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার মধ্যে কি সার্থকতা আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিও।

কোনও মূর্ত্তি হয়ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের দ্বারা পূজিত হইত। কোনও মূর্ত্তি হয়ত বা সম্রাট শশাঙ্কের ছিল প্রিয়। কোনও মূর্ত্তি সম্রাট স্কন্দগুপ্ত দিগ্বিজয়-কালে আনিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সহিত তোমার সাধন-ভজনের সম্পর্ক কি আছে?

মাস কয়েক আগে একটী বিধবা মহিলা আমার হাতে একটী

পাথরের নুড়ি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহা শিবলিঙ্গ না শালগ্রাম। আমি বলিলাম যে, যে যাহা ভাবে, ইহা তাহাই। মেয়েটী বলিল যে, সে ইহা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছিল এবং ইহা শিব না নারায়ণ তাহা না জানিয়াই প্রত্যহ ফুল-জল দিয়া আসিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সে প্রত্যহই পথে ঘাটে এইরূপ বা অন্যরূপ নানাবিধ নুড়ি পাইতে থাকে, কল্পনা করিলে যাহাকে কোনও দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া মনে করা চলে, তবে সে কি করিবে। মেয়েটী লজ্জিত ভাবে স্বীকার করিল যে, ইতিমধ্যে এভাবে গুটি পাঁচেক ঠাকুর সে পথে-ঘাটে সংগ্রহ করিয়াছে এবং সকলগুলি মূর্ত্তিতেই ফুল-জল দিয়া আসিতেছে। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন সে চিন্তিতাও হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, এত ঠাকুরকে ফুল-জল দিতে দিতে কারখানায় যাইবার সময় পার হইয়া যায়।

মেয়েটী কোনও একটী কারখানায় চাকুরী করে।

আমি বলিলাম যে মেয়েটী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া এখন ঠাকুরগুলির পূজাই করিতে থাকুক। চাকুরী করার চাইতে ঠাকুরপূজা অনেক মহৎ কাজ।

মেয়েটী বলিল যে সে এখন ঠাকুরগুলি সরাইয়া ফেলিতে চাহে। কিন্তু কোথায় সরাইবে, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না। তবে আমি যদি আমার আশ্রমের মন্দিরে আনিয়া এগুলির পূজা-ব্যবস্থা করি, তাহা হইলে প্রতি মাসে সে তাহার মাহিনা হইতে পাঁচটী করিয়া টাকা ঠাকুরপূজার ব্যয় বাবদ দিতে সানন্দে প্রস্তুত।

আমি বলিলাম যে, তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ আশ্রমের

মন্দিরে দুই বিগ্রহ থাকিতে পারেন না। তবে আমার হাতে সঁপিয়া দিলে আমি সব ঠাকুর একেবারে গঙ্গাগর্ভে সমর্পণ করিয়া মেয়েটীকে নিষ্কৃতি দিতে পারি।

মেয়েটী সম্মত হইল। সব ঠাকুর আমার হাতে আনিয়া দিল। আমি পথে-পাওয়া সব দেবতাকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম।

মাটির তলায় পাথরের মূর্ত্তি পাইয়া তোমার তাহাই হইয়াছে। ধূমধাম করিয়া যাহা করিয়া যাইতেছ, তাহা ভক্তি নহে, তাহা আত্মপ্রচার মাত্র। তোমার সকল আড়ম্বর নিজেকে জাহির করিবার জন্য, ভগবানকে তুষ্ট করিবার জন্য নহে। ভগবানকে যে ভালবাসে, সে বাহিরের লোকের কাছে সাধু সাজিবার জন্য কিছু করে না। ভগবানকে যে ভালবাসে, সে নিজের সাধনের ব্যাপারে একনিষ্ঠা হারায় না। বলিতেছ, গুরু করিয়াছ। বলিতেছ, সাধন করিতেছ। তবে তোমার মন এমন বর্হির্ম্মুখ এবং বহুমুখ কেন হইতেছে?

আর একটী খবর শুনিলে তুমিও হয়ত কৌতুক বোধ করিবে। ত্রিপুরার অমরপুর অঞ্চল হইতে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণবন্ধু পাহাড়ী জাতির ভিতরে তাহার কাজের বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইয়াছে। অন্যান্য সংবাদের সহিত এই সংবাদটীও তাহাতে আছে যে, সেখানে হঠাৎ এক পাহাড়ীয়া গোঁসাইর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি নানা অকথ্য উপায়ে পাহাড়ী জাতি সমূহকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া বেড়াইতেছেন। তিনি কিছুকাল হয় কোথায় যেন কৌপীন ও ভেক নিয়াছেন এবং প্রচার করিতেছেন যে প্রত্যেক মানুষেরই বহু দেবতার পূজা করা উচিত। কেননা, এক এক দেবতার পূজা দ্বারা একটু একটু ধর্ম্ম হয়।

তুমি যদি লক্ষ্মীপূজা কর, তাহা হইলে তোমার একটুকু ধর্ম্ম হইবে। শিবপূজা করিলে আর একটুকু ধর্ম্ম হইবে। নানা দেবতাকে পূজা করিয়া বহুবার একটু একটু করিয়া ধর্ম্ম হইলে সবটা ধর্ম্ম একত্র যোগ করিলে অতি বিরাট জিনিষ হইবে এবং তাহার ফলে তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইবে। ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমাদের আদর্শের বিরুদ্ধে নানা কল্পিত অভিযোগ করিয়া দলে দলে পাহাড়ীদের তিনি ক্ষেপাইতেছেন। বেচারী কৃষ্ণবন্ধু ব্রহ্মচারী মহা-বেকায়দায় পড়িয়া গিয়াছে।

পাহাড়ী সাধুর এই যুক্তিগুলির অযৌক্তিকতা একবার ভাবিয়া দেখ। ঈশ্বর-সাধন কণা কণা করিয়া এখানে ওখানে ধর্ম্ম আহরণের জন্য নহে, ভগবানে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া যাইবার জন্য। ডুবিতে হইলে একটী স্থানেই ডুবিতে হয়। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পাহাড়ী জাতিকে তাহা কে বুঝাইবে বল? কিন্তু তোমারও কি ততটাই অনুন্নত?

সমগ্র বছর খাটিয়া যতটা ধান্য উৎপাদন হয়, তাহার দশ আনা যাহারা মদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যয় করিয়া দেয়, তাহাদের আর সভ্যতাভিমানী, শিক্ষাগর্ব্বিত, উন্নত বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদানকারী তোমাদের মধ্যে যুক্তি-বুদ্ধির কি কোনও তারতম্য থাকিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নূতন এবং পুরাতনদের কথা তুমি তুলিয়াছ। তুমি নূতনকে তাহার কর্ম্মচাঞ্চল্যের জন্য কটাক্ষ করিয়া মন্তব্য করিয়াছ যে, পুরাতন মদ্য ভাল, পুরাতন ভৃত্য ভাল, পুরাতন স্মৃতি ভাল, পুরাতন পুঁথি ভাল। নূতনেরা কোনও বস্তুকে তাহাদের স্বরূপে চিনিতে পারে না বলিয়া দুই দিনের মাতন মাতিয়া শেষে ঝিমাইয়া পড়ে। সুতরাং পুরাতন কর্ম্মীদের উপরে কার্য্যভার ন্যাস্ত কর সঙ্গত।

তোমার কথার ভিতরেই তোমার যুক্তির উপযুক্ত খণ্ডন রহিয়াছে। নূতনেরা দুই দিনের মাতন মাতিয়া যখন ঝিমাইয়া পড়ে, তখন ত' তাহারা পুরাতনই হইয়া পড়ে। পুরাতন হইয়া পড়ে বলিয়াই তাহারা ঝিমাইয়া পড়ে। পুরাতনের নানা গুণের সঙ্গে ঝিমাইয়া পড়াও একটা গুণ। সুতরাং তুমিই ত' প্রকারান্তরে নূতনের জয়গান গাহিতেছ। যেই সকল পুরাতন কিছুতেই পুরাতন হইতে চাহে না, তাহারা কখনো ঝিমায়ও না। এই জন্যই প্রকৃত কর্ম্মীরা নিতুই নূতন থাকিতে চাহে।

আমি কিন্তু চিরনূতনের মধ্যে চিরপুরাতনকে নিয়ত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সেই পুরাতন কখনও ঝিমাইয়া পড়ে না। এমন শাশ্বত পুরাতন আছে, যাহার ভিতরে চিরনূতনের নিত্য খেলা। আমি তাহার পূজারী। এই জন্যই প্রাচীন শাস্ত্র, আচার, রীতি, নীতি, প্রথা বা

ব্যবহারের সহিত যেখানে আমার মনের মিল ঘটে নাই, সেখানেও আমার শ্রদ্ধার অপ্রতুলতা নাই। আবার চির-উচ্ছৃঙ্খল, ভাঙ্গিবার ব্যাকুলতায় যুক্তিহীনভাবে আগ্রহশীল নূতনদের ভিতরেও আমি শাশ্বতের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। এই জন্য আমি নূতনদেরও সমর্থনে একেবারে কুণ্ঠাহীন। সুমেরু কুমেরু ছাড়াইয়া এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ব্যাপিয়া আমার দৃষ্টি। এই জন্যই আমাকে অনেক সময়ে তোমরা বুঝিয়া উঠিতে পার না।

পুরাতনের অহমিকা থাকে, গর্ব্ব থাকে, সময় সময় দম্ভও থাকে। নিজের বাখানি নিজে গাহিয়াই পুরাতন অনেক সময়ে তাহার দিন কাবার করে, কাজে হাত দিবার তার অবসর, রুচি, শক্তি ও সামর্থ্য কমিয়া যায়। এই জন্যই তোমাদের নির্ব্বিচারে নূতনদের মধ্যে প্রবেশ করা আবশ্যক। সংঘে, জাতিতে, দেশে ও রাষ্ট্রে নূতনের অনুপ্রবেশ না থাকিলে চিরশাশ্বত পুরাতনও জরাভারে জীর্ণ এবং রোগভারে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

এই জন্যই আমি মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ-সন্তানকে জাতিভেদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া একবার শুঁকিয়া দেখিতে বলিয়াছি যে, অব্রাহ্মণ সমাজগুলির লোকের রক্তে মানুষের গায়েরই গন্ধ আছে কিনা। এই জন্যই আমি হিন্দুমাত্রকেই উপদেশ দিয়াছি, বন-পর্ব্বতে কানন-কান্তারে জল-জঙ্গলে উপত্যকা-অধিত্যকায় সাগর-মরুতে দেশে দেশে গিয়া সকল অবহেলিত, অনাদৃত, অন্যায় ভাবে ঘৃণিত ও উপেক্ষিত মানব-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া প্রবেশ করিতে। আজ চিরপুরাতনে ও চিরনূতনের সমন্বয়, সমাহার ও সমুচ্চয় ঘটাইতে হইবে।

তোমরা আমার কথায় সাহিত্য খুঁজিয়াছ, কবিত্ব প্রত্যাশা করিয়াছ, কর নাই কেবল মর্ম্মগ্রহণের চেষ্টা। তোমরা তোমাদের এই অনবধানতার জন্য আবার আমাকেই শতবার দায়ী করিয়া নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছ। নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে হইলে কাহারও ঘাড়ে দোষ ফেলিতে হয়। দিন কয়েক হয় নারায়ণগঞ্জের একখানা পত্র পাইয়াছি। তাহাতে স্পষ্ট অভিযোগ রহিয়াছে যে, আমার অজস্র অকুণ্ঠ প্রয়াসগুলি যে সফলতার কনক-কিরীট শিরে ধারণ করিতেছে না, তাহার কারণ ত' আমার একচোরা ভাবের ভিতরে রহিয়াছে। আমার অভিক্ষা ব্রত গ্রহণ করিবার ফলে দুয়ারে দুয়ারে চাঁদার খাতা নিয়া হাজির হইবার সুযোগ নষ্ট হইয়াছে আর এই জন্যই কলিকাতায় গঙ্গাতীরে বিশালভূমি ক্রয় করিয়া সেখানে তোমাদের পূজা-অর্চ্চনার জন্য মন্দির তৈরী হইতে পারিতেছে না। আমি যদি চাঁদার খাতা লইয়া ঘরে ঘরে যাইতাম, তাহা হইলে কত কত লোকের সহিতই না জানি আমার পরিচয় হইত, যোগাযোগ হইত এবং এই পরিচয় ও যোগাযোগের মহিমায় তোমাদের কলিকাতা, কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, দ্বারকা, মথুরা, রামেশ্বর, পুরী ও বিন্ধ্যাচলে আসিয়া মাঝে মাঝে উঠিবার একটা করিয়া আস্তানা হইত।

তোমাদের যুক্তির নমুনা তোমরা একটু বিচারকের দৃষ্টিতে দেখিও। তোমাদের নিজেদের প্রয়োজন-বোধ তোমাদের প্রতিজনকে ত্যাগ-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করিবে না, পরন্তু আমাকে আমার অযাচক-বৃত্তির জন্য তিরস্কার করিতে উদ্যত হইবে। তোমাদের পুত্র-কন্যার বিবাহের

প্রয়োজনবোধ হাজার হাজার টাকা জলের মত অপব্যয় করিতে তোমাদের প্রেরণা দেয় কিন্তু কলিকাতা, কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বারে তোমাদের উঠিবার বা অর্চ্চনা করিবার স্থান গড়িয়া নিবার জন্য নিজেদের প্রাণ হইতে ত্যাগের সেই প্রেরণা আসে না। তখন তোমরা দিব্যি এই কথা ভাবিয়া অন্তরে আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিয়া থাক যে, তোমাদের বোকারাম বাবামণিটী কেন দুয়ারে দুয়ারে চাঁদার জন্য ঘুরিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তোমাদের জন্য দশটা মন্দির, বিশটা ধর্ম্মশালা, ত্রিশটা কলেজ, চল্লিশটা পাঠশালা গড়িয়া দিলেন না। তোমাদের হাঁদা মূর্খ গুরুদেবটী লোকের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য যাইতে পরাঙ্মুখ ত' হইলেন কেবল লাজ ও মুখচোরামির জন্য। তাঁহার সৎসাহস থাকিলে তিনি ছোট-বড় সকল দাতাদের কাছে যাইয়া নিজের পরিকল্পনার মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া শত শত ব্যক্তিকে নিজের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে কি পারিতেন না? হাজার হাজার বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে যিনি উদাত্ত কণ্ঠে বজ্রগম্ভীর ভাষণ দিতে পারিয়াছেন, এই কাজটুকুতে অবহেলা করা কি তাহার একটা অকাঠ মূর্খতাই নহে?

তোমাদের যুক্তির ধারা ত' এই। তোমাদের সঙ্গে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিয়া কোনও লাভ আছে? পুপুন্‌কী মরুভূমিতে আজ বত্রিশ বৎসর ধরিয়া খাটিতেছি। কেবল পাথর তুলিতেছি আর কাঁকর বাছিতেছি। "জল, জল, জল" করিয়া যেখানে কতবার আমি ও আমার সহকর্ম্মীরা কঠোর গ্রীষ্মে পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকাইয়া এমন কি সংজ্ঞাহীন পর্য্যন্ত হইয়াছি, সেখানে প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি জুড়িয়া

জলাশ্রয় তৈরী করিতেছি। দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াই ঘুমন্ত মানবাত্মাকে জাগাইবার জন্য, আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুপুন্‌কী ফিরিয়া আসি এখানকার পাথর, কাঁকর, মাটি খুঁড়িবার জন্য। এবার আশ্রম দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীদের রিলিফ দিতে যাইয়া এমন অর্থকৃচ্ছ্রে পড়িয়াছে যে, যে কয়দিন পুপুন্‌কী থাকি, একজন কুলীর খরচ বাঁচাইবার জন্যই আমাকে স্বহস্তে লাঙ্গলের মুঠি ধরিয়া ভূমি-কর্ষণ করিতে হইবে। শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন দুই একটা বছর নিজ হাতে লাঙ্গল-চষাটা বন্ধ ছিল। এবার তাহার শোধ সামান্য দুই পাঁচ দিনেই তুলিয়া নিতে হইবে। এত কাজ যার, তার আবার মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়া চাঁদা সংগ্রহের সুযোগ কি করিয়া হইতে পারে? আমার যদি অযাচক-ব্রত নাও থাকিত, তবু ত' ইহারই জন্য আমি চাঁদা তুলিতে যাইতে পারিতাম না।

আশ্রমের জন্য চাঁদা তুলিতে আমি তোমাদেরও নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু তোমাদের নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য, ত্যাগবুদ্ধিতে মরিচা ধরাইয়া দিবার পক্ষে ইহাই কি একটা পরম যুক্তি হইয়া গেল? ক—আশ্রম জোর করিয়া শিষ্যদের কাজ হইতে প্রতিদিন কিছু কিছু টাকা তোলেন। খ—আশ্রম শিষ্যদিগকে অভিসম্পাতের ভয় দেখাইয়া মাসান্তে বৎসরান্তে এক একটা করিয়া মোটা টাকা প্রতি জনের কাছ হইতে আদায় করেন। গ—আশ্রম শিষ্যদিগের দ্বারা সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকের কাছ হইতে প্রতিনিয়ত চাঁদা আদায় করাইবার সুব্যবস্থাতেই নিজেদের ধ্যান-ধারণার চৌদ্দ আনা ব্যয়িত করিয়া থাকেন। ঘ—আশ্রম গৈরিকধারী সাধুদিগকে কীর্ত্তন-সম্প্রদায় নিয়া রাস্তায় রাস্তায়

শোভাযাত্রা করিয়া পথের দুই ধার হইতে অর্থসংগ্রহে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। অধিকাংশ আশ্রমই কোথাও ধর্ম্মপ্রচারার্থে কোনও ভাষণ দান করিলে উহাকে পরদিন হইতে বেপরোয়া চাঁদা-সংগ্রহ-অভিযানের ভুমিকা স্বরূপে ব্যবহার করেন। এই কাজগুলি আমি করি নাই, করি না এবং করিব না। কেবল ইহারই জন্য তোমাদের সংঘ দশটা কলেজ, বিশটা হাসপাতাল, পঞ্চাশটা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারে নাই বলিয়া তোমরা মনে করিতেছ। আসল কারণ যে কি, তাহা ভাবিবার তোমাদের অবসর হয় নাই। নিজেদের দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদনের দুশ্চিন্তা, ছেলে-পড়ানো ও মেয়ে-বিবাহের দুর্ভাবনা তোমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমি আমার দিক হইতে যুক্তি দিয়া তোমাদের দোষক্ষালন করিয়া থাকি। কিন্তু নিজেদের ভিতরের ত্রুটিগুলি খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন তোমাদের রহিয়াছে।

পুরাতনেরা ঝিমাইয়া যাইতেছে। এইরূপ নানা বিজ্ঞজনোচিত মন্তব্য করিয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য-পালন হইল বলিয়া ভ্রম করিতেছ। কেন আমি নূতনদের অভিনন্দন দিব না? আমি প্রেমেরই কাঙ্গাল। যাহার প্রেম আছে, সেই আমার বরণীয়। নূতন-পুরাতনের বিচার বড় কথা নহে। প্রেম সেবাবুদ্ধি দেয়, চালাকির বুদ্ধি কমায়, হিংস্রতা ও প্রতিহিংসার বিনাশ-সাধন করে, কে ছোট হইল আর কে বড় পীড়ি পাইল, তাহার বিচার ছাড়িয়া দেয়। প্রেম অকপট হিতৈষণায় নিঃস্বার্থ ভালবাসায় একজনকে অপরের সমীপস্থ করে। সেই প্রেমিককেই আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। কে নূতন বলিয়া অনভিজ্ঞ, কে পুরাতন বলিয়া পরমসুদক্ষ, কে নূতন বলিয়া প্রাণের চাঞ্চল্যে চিরনির্ভয়, কে

পুরাতন বলিয়া জড়তাগ্রস্ত আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আতুর, তাহা আমার বিচার্য্য নহে। যে প্রেমিক, সেই নূতন, সেই সমাদরণীয়, সেই বরণীয়, সেই বাঞ্ছিত। আজ আসিয়াছে বলিয়াই কেহ নূতন হয় নাই, কাল আসিয়াছিল বলিয়াই কেহ পুরাতন হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এইমাত্র কলিকাতা হইতে বারো তেরো মাইল দূরে রাজগঞ্জ ন্যাশান্যাল মিল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আজিকার সমবেত উপাসনায় কলিকাতার প্রায় সকল অঞ্চল হইতেই কিছু কিছু ছেলেরা গিয়াছেন, এমন কি মেয়েরাও বাদ যান নাই। খড়্গাপুর অঞ্চল হইতেও জনা তিনেক গিয়াছেন। মুষলধারে বৃষ্টি নামিতেছে। সমাগত স্থানীয় জনতার একাংশ নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। কিছু এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া ভিজিলেন। উপাসনা-রত-নর-নারীরা একজনেও নড়িলেন না। মাথার উপরে অজস্র বারিধারা লইয়া প্রতিজনে গাহিয়া যাইতে লাগিলেন,—বন্দে সদা সুন্দরং শ্রীসদ্‌গুরুম্। ইহাই রাজগঞ্জের দৃশ্য। দেখিলে সুখী হইতে, চমৎকৃতও হইতে। ইহা কি বারিবর্ষণ না বন্যা-বর্ষণ? সমস্তটা আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ফোঁটায় ফোঁটায় নহে, বালতিতে বালতিতে বা দমকলের পাইপ বাহিয়া যেন উপর হইতে নীচে বৃষ্টি পড়িতেছে। দুই একজনকে কাণের ছিদ্রে তূলা গুঁজিতে হইল। তবু কেহ উঠিলেন না, গাহিয়া চলিলেন, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং। এমন উপাসনা পরিচালন করিয়া আনন্দ আছে।

মনে পড়িয়া গেল আর একদিনের কথা। সেদিন কলিকাতা বহু-বাজারে কোলে-মার্কেটের বিস্তীর্ণ ছাদের উপরে বসিয়া আমরা বহুজনে উপাসনা করিতেছিলাম। ঝড় আসিল, কেহ নড়িলেন না। বারিবর্ষণ চলিল, অনাবৃত মস্তকে নিশ্চিন্তে বসিয়া সকলে স্তোত্রপাঠ করিয়াই যাইতে লাগিলেন। মুহুর্মুহু বজ্রগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ-চমক চলিতে লাগিল, কেহ উঠিলেন না। দুই এক জন ছাতা আনিবার জন্য নীচে দৌড়িলেন কিন্তু কেহই ছাতা মাথায় দিতে রাজি নহেন। নৈসর্গিক উৎপাত নিতান্তই ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়াছে, সমবেত ঈশ্বরোপাসনা শেষ না করিয়াই আমরা স্থানত্যাগ করিব, ইহা কি কখনো হইতে পারে? ঝড়ের বাতাস আস্ত মানুষ শুদ্ধ উড়াইয়া নিয়া যাইতে চাহে, তবু উপাসকেরা নিজেদের আসল কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন—যথাভিসন্ধং কুরু কল্যাণম্। সমবেত উপাসনা এখানে তাহার মনোলোভা মূর্ত্তিকে সকলের চোখের সামনে অতুলনীয় সুন্দরতায় যেন তুলিয়া ধরিল।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়িয়া গেল, পূর্ব্ববঙ্গের গোঁসাইপুর গ্রামের এক ভাষণ। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়া যে উপধর্ম্ম গ্রামে গ্রামে গ্রামে গোপনে শিকড় গাড়িয়াছে, আমি তাহা সভামঞ্চ হইতে

উৎপাটিত করিতেছিলাম। হাজার খানিক শ্রোতা বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। কল্পনাতীত প্রাখর্য্যে প্রচণ্ড বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল কিন্তু একজনও উঠিলেন না। পূর্ণ এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া সভামঞ্চ ত্যাগ করিলাম। তখন লোকের খোঁজ পড়িল, ছাতা কোথায় মিলিবে, কাপড় কোথায় বদল হইবে।

মনে পড়িয়া গেল ডিব্রুগড়ের কথা। সহরের সেরা ডিব্রুগড়। সেখানে যখন যাহা ঘটিয়াছে, সবই অতুলনীয়, অভাবনীয়, অভূতপূর্ব্ব। প্যারাডাইস মাঠে সমবেত উপাসনার মঞ্চ সাজিয়াছে। বসিয়াছেন শত শত উপাসক-উপাসিকা। চলিতেছে স্তোত্রপাঠ সমস্বরে শত কণ্ঠে প্রাণ-ভরা প্রেম-সহকারে। সহসা ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিকের সব কিছু নড়িতে লাগিল। কাঠে কাঠে গাছে গাছে ঠকঠকানি সুরু হইল। স্মরণে পড়িয়া গেল সকলের সেই প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পের কথা, যাহা এই সেদিন উত্তর আসামকে ধ্বংসপ্রায় করিয়া ছাড়িয়াছে, যাহা ব্রহ্মপুত্রের বক্ষ শুষ্ক করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়াছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত ইমারত মাটির তলায় সমাধি দিয়া জন-মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষণকালের জন্য কাহারও কাহারও মনে চাঞ্চল্য আসিল কিন্তু নিমেষ-মধ্যে সব চাঞ্চল্য চাপা পড়িয়া গেল "জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, ওঙ্কারগুরু"র গুরুগম্ভীর আরাধনা-মন্ত্রের নীচে। নিঃশঙ্ক নির্ভয় চিত্তে প্রত্যেক প্রাণী উপাসনা করিলেন, এক জনেও স্থানত্যাগ করিলেন না।

সেদিনই বা সম্ভবতঃ তার পরের দিন সায়ংকালে ডিব্রুগড়ে আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা। ভাষণ দিতে দাঁড়াইয়াছি। স্থান সেই

প্যারাডাইজ মাঠ। জল-কাদায় মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাজার হাজার শ্রোতা ভাষণ শুনিতেছেন। জননীরাও সংখ্যায় কম নহেন। কি কারণে জানিনা, এমন দুর্য্যোগেও সহর ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়াছিলেন। সত্য সত্য লোকারণ্যই হইয়াছিল। জননীরা অনেকে শিশু কোলে নিয়া আসিয়াছেন, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাষণ শুনিতেছেন। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, গ্রাহ্য নাই। কিন্তু বক্তৃতা সপ্তমে চড়িল বৃষ্টিও তাহার সপ্তমে চড়িল। একটী প্রাণীও স্থানত্যাগ করিলেন না। মায়েরা শিশুদের মাথাগুলি বুকের ভিতর আরও সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিলেন কিন্তু সভাস্থল ছাড়িলেন না। আমার মুখের সামনে তিনটা আনকোরা নূতন মাইক্রোফোণ পরম বিক্রমে নিজেদের কাজ করিয়া যাইতেছিল। আমাকে ঘোষণা করিয়া যাইতে হইল,—"ডিব্রুগড় আজ প্রমাণিত করিয়াছে, এ জাতি মরে নাই, মরিতে পারে না। কখনও মরিবে না। মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত সৎ উপাদান ইহার ভিতরে প্রচুর রহিয়াছে।" কোনও রাজনৈতিক সভা নয়, নির্ব্বাচনের সভা নয়, তবু কেন দলে দলে লোক শুধু ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য এমন বাদলকে অগ্রাহ্য করিবে? ইহা শুধু আমারই বাগ্ বিভূতির মহিমা, এমন কথা ভাবিতেও দ্বিধা-বোধ করি। শ্রোতাদের চরিত্রের নিষ্ঠা এবং আগ্রহের দৃঢ়তাই এই ক্ষেত্রে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

চরিত্রে যাহাদের এমন দৃঢ়তা, এমন নিষ্ঠা আছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল ভাবিতে পারি না। তোমার ভবিষ্যৎও অনুজ্জ্বল নহে।

নিষ্ঠা থাকিলে যেমন ভয়কে জয় করা যায়, তেমন যায় প্রলোভনকেও। অনেকে ভয়কেই অধিক ভয় করে কিন্তু প্রলোভনেই ভয়ের কারণ বেশী। প্রলোভন যখন হাত-ছানি দিয়া ডাকে, তখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা অনেক বীরপুরুষেরও অসাধ্য হয়। এ সময়ে রক্ষাকারিণী হইতেছে নিষ্ঠা। নিজের আদর্শে সুস্থির থাকিও, তাহার অনুসরণে থাকিও অবিচল।

তোমার চারিদিকে প্রলোভন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। ইহাদিগকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করিবার সাহস অর্জ্জন কর। প্রেমকে নিবদ্ধ কর সত্য বস্তুতে, তাহা হইলেই ইহা সহজ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ
কোলাঘাট (মেদিনীপুর)
৬ই শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা গ্রামে মাত্র চারিটী সমসাধক রহিয়াছ আর তারই মধ্যে নিয়মিত সমবেত উপাসনা চালাইয়া যাইতেছ জানিয়া সুখী ও আনন্দিত হইলাম। তবে তোমাদের সমবেত উপাসনাকে এই চারিটী পরিবারের লোকের মধ্যেই আবদ্ধ না রাখিয়া গ্রামের আরও দশ বিশটী পরিবারের লোককে ইহার প্রতি আকৃষ্ট কর। আমি তোমাদিগকে

কেবল নিজের মুক্তির জন্য সাধন করিতে শিক্ষা দেই নাই। আমি তোমাদের প্রতি জনকে জগতের কল্যাণের জন্য তৈরী হইবার সাধনায় দীক্ষিত করিয়াছি। তোমরা তোমাদের সমবেত উপাসনায় সমদীক্ষিত পরিবারগুলি ছাড়াও অন্য পরিবারসমূহের নরনারীদিগকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিও। যাহাতে তোমাদের সমবেত উপাসনাতে অন্যান্য মতের লোকেরা আসিতে দ্বিধা বোধ না করেন তাহার জন্য, আমি নিয়ত তোমাদের ধ্যানের দেবতা হইয়াও সমবেত উপাসনার সর্ব্বজনীন অনুষ্ঠানগুলিতে আমার প্রতিচিত্র না রাখিতে তোমাদিগকে বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছি। এদেশে অনেক বহুজনপূজ্য মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকে ঈশ্বরকল্প বলিয়া পূজিতও হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিচিত্রকে পরমেশ্বরের প্রতীকের সহিত একত্র রক্ষা করায় বা পরমেশ্বরের প্রতীককে একেবারে সরাইয়া দিয়া তাঁহাদেরই প্রতিচিত্রকে সর্ব্বজনের পূজ্য, ধ্যেয় ও আরাধ্য করিবার চেষ্টা করায় অনেক মহামানব সর্ব্বজনের অন্তরে অবাধ প্রবেশে বাধা পাইয়াছেন। বাধা দিয়াছে বিচারশীল, মননশীল, যুক্তিপরায়ণ সৎলোকদের পরিমিতি-বোধ ও সামঞ্জস্য-প্রিয়তা,—যাহা আতিশয্যকে করে বর্জ্জন এবং অতিঞ্জনকে করে অপছন্দ। এই সকল বিবেচনা করিয়াও আমি তোমাদিগকে সর্ব্বসাধারণের যোগদানীয় সমবেত উপাসনাতে পূজার স্থানে আমার প্রতিচিত্র রাখিতে নিষেধ করিয়াছি। সুতরাং জগন্মঙ্গল সঙ্কল্পের সাধক হইয়া তোমাদের পক্ষে অপর লোককে সমবেত উপাসনাতে আকর্ষণ করা ত' অনেক সহজ ব্যাপার হইয়া গেল।

তোমরা একটা গ্রামে মাত্র চারিজন সমসাধক আছ। বিশেষ করিয়া দিনের পর দিন গ্রাম হইতে হিন্দু জন-সংখ্যা কেবলই কমিতেছে। যাহারা আছে বা থাকিতেছে, তাহাদেরও মন রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক নানা প্রকার অনিশ্চয়তার দরুণ চঞ্চল। তবু তোমরা হতাশ হইও না। অতীতে যাঁহারা সমগ্র জগৎ জুড়িয়া প্রেমের আলো ছড়াইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সংখ্যায় ছিলেন মুষ্টিমেয়। সংখ্যার একটা কৌলীন্য পার্থিব জগতের অনেক ব্যাপারে থাকিলেও তোমাদের এই অনাধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে প্রাণভরা শুদ্ধি, সাত্ত্বিকতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার মূল্য অনেক বেশী। এই ত' আজ আমি কোলাঘাটে আসিয়াছি, আমার থাকিবার স্থান হইয়াছে সহর হইতে এক মাইল উত্তরের এক গ্রামে এক সজ্জনের গৃহে। একটী মাত্র ছেলে ছিল এখানে আমার দীক্ষিত, আর একটী ছিল মানস-সন্তান। এই দুইটী প্রাণীর একান্ত প্রয়াসে আজ বেলা নয়টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটা অপূর্ব্ব জাগরণের উদ্দীপনা এখানে সৃষ্ট হইয়াছে। সংখ্যা নিশ্চয়ই কাজে আসে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত এবং প্রয়োজন-কালে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার যোগ্য নেতা থাকে। কিন্তু যেখানে শুদ্ধচেতারা সংখ্যাল্প, সেখানেও তাঁহারা নিজেদের অন্তরের পবিত্রতার সহিত উদ্দীপনার একাগ্রতা ও জাগৃতির স্থায়িত্বের শুভ সংযোগ সাধন করিয়া অনেক অকল্পনীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। তোমরা এই সত্যে সর্ব্বদা বিশ্বাস করিও।

সংসারের অভাব অনটনকে কখনো প্রাধান্য দিও না। অভাব-অনটন অধিকাংশ মানুষকেই নিষ্পেষণ করিতেছে। সেই সীমাসংখ্যাহীন

নরনারীদের মধ্যেই তুমি একজন। জগতের আর্থিক কাঠামোর সঙ্গত রূপান্তর না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশের মাথার খুলির উপরে স্বল্প-সংখ্যকের আকাশস্পর্দ্ধী সৌধ-নির্ম্মাণ চলিতেই থাকিবে। কিন্তু তার জন্য তুমি তোমার অন্তরের বিশাল প্রসারকে দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তায় ডুবাইয়া রাখিতে পার না। দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য নীতিসম্মত ধর্ম্মসঙ্গত সকল উপায় তুমি অবলম্বন করিবে কিন্তু কখনও কখনও যদি অসফল হইয়া পড়, তবু আশা ছাড়িবে না। "পাপপথে ধনার্জ্জন করিব না,—" ইহা তোমাদের প্রত্যেকের সুসঙ্কল্পিত প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। অনেকে পাপার্জ্জিত ধন আনিয়া মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতের অন্ধলোকের প্রশংসা অর্জ্জন করে এবং মনে মনে নিজেকে ধন্য ধন্য বলিয়া জ্ঞান করে কিন্তু সদুপায়ে অর্থ অর্জ্জন করিয়া সৎকার্য্য করাই তোমাদের লক্ষ্য হউক। অনেক সৎ সাধু মহান্ পুরুষকে চোরেরা আসিয়া দস্যুতা-কলঙ্কিত পাপ-কলুষিত অর্থ দিয়া যায়। প্রকৃত সাধু-সজ্জনেরা এই সকল অর্থ স্পর্শ করিতে ভয় পান। দাতার অর্থের সহিত তাহার পাপও আসিয়া থাকে। আমি চাহি, তোমরা বরং বড় বড় মঠ, আশ্রম, কলেজ, হাসপাতাল স্থাপনের গৌরব হইতে বঞ্চিতই রহিলে, তথাপি পাপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা আত্মবঞ্চনা করিও না।

কলিকাতায় একটী রমণী দায়ে পড়িয়া গণিকাবৃত্তি করিত। স্বামী তাহার পক্ষাঘাতগ্রস্ত, চিকিৎসার অর্থ নাই। কন্যা তাহার অনূঢ়া, শিক্ষাদানের উপায় নাই। রমণী পাপ-পথে চলিয়া অর্থ অর্জ্জন করিতে লাগিল। স্বামীর চিকিৎসা হইল, কন্যার বিদ্যার্জ্জন হইল কিন্তু

সংসারে আসিল না শান্তি। মহাপাপ দুশ্চিকিৎস্য রোগরূপে প্রথমে করিল দেহে আত্মপ্রকাশ, তারপরে আসিল কন্যার অকৃতজ্ঞতা, স্বামীর পরনারীরত সুরা-প্রমত্ততা। দুর্ভাগিনী নারী ধরণীর আলোকে মুখ তুলিয়া চাহিতে গিয়া অন্ধকারের চির-অতলে ডুবিয়া গেল। অশান্তি তাহাকে দগ্ধ করিতে করিতে চিতার অঙ্গারে পরিণত করিল।

টাকার জন্য সব কিছুই করা যায় না। তোমরাও টাকাকে বড় করিয়া দেখিও না। অনেকের জীবনেই টাকার ফাঁকা আওয়াজ বড় লোভনীয়। তোমরা এই প্রলোভনের হাত এড়াইয়া চলিও। ক্ষুদ্র ভাবেই কাজ করিয়া যাও। নাই বা লোকে যশ গাহিল। নাইবা দেশে নাম রটিল। নাই বা কোনও স্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপিত হইল। নাই বা বিশ্ববাসী তোমাদের মনে রাখিল। অখিল সন্তোষভরা সানন্দ অন্তরে তোমরা একটু একটু করিয়াই দারিদ্র্যের যোগ্য সৎকৃতি করিয়া যাও। নাম-না-জানা সাধারণ লোকের মধ্যেই নাম-না-জানা সাধারণ সেবক তোমরা মিশিয়া যাও। তোমাদের প্রেম তোমাদের সহিত মানবজাতির সম্বন্ধকে সকলের অগোচরে অতি গোপনে অক্ষয় করিয়া রাখুক।

তোমার বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী তোমাদের সংসারে বাস করিয়া নিত্য-কলহে তোমার জীবন অতিষ্ঠ ও জরাজীর্ণ করিয়া দিতেছেন জানিয়া সত্যই সন্তপ্ত হইলাম। বিধবা মহিলারা এক একটা সংসারে প্রকৃত অভিভাবকের মত থাকিয়া সমগ্র সংসারটাকে লালন-পালন করিয়া মানুষ করিয়া থাকেন। মাতৃহীনের মাতা হইয়া, ভগ্নীহীনের ভগ্নী হইয়া, কন্যাহীনের কন্যা হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়া নিজেদের সাত্ত্বিকতার মহিমাতেই সংসারের কর্ত্তৃত্ব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়া থাকেন। তোমার দিদির ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত হইতেছে জানিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইলাম। হঠাৎ করিয়া আমি ইহার প্রতীকারের কোনও পন্থা তোমাকে বলিতে পারিতেছি না। তবে একটা কাজ যদি এখনই শুরু করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে কিছু সুফল ফলিবে। শূন্য ঘটেরই আওয়াজ বেশী। পেটে একটু বিদ্যা ঢুকিলে আওয়াজ কমিয়া যায়। তুমি অবিলম্বে কোনও কৌশল করিয়া তোমার দিদিটীকে বিদ্যানুরাগিণী ও বিদ্যাভ্যাসিনী করিতে চেষ্টা কর। অশিক্ষিত রাখিয়াই ত' আমরা বিধবাগুলিকে সমাজের জঞ্জালে পরিণত করিয়াছি।

সমাজ-মধ্যে যে সকল বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছে, তাহার সম্পর্কে এখন তোমাকে কোনও সদুপদেশই দিতে পারিব না। অপরের পাপের স্পর্শ নিজের গায়ে না লাগে, এই ভাবে এখন চল। রাষ্ট্রীয় অবস্থা সকল দেশে সমান নহে। নিজের চরিত্রে প্রভূত বল না থাকিলে অপরের অনুসৃত পাপ-চক্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার সংশোধন-চেষ্টা সঙ্গত নহে। তবে, পাপি-অপাপি-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি অন্তরের প্রেম রক্ষা করিয়া চল,—কারণ, সকলেই ত' একই ঈশ্বরের সন্তান এবং একদিন সকলকেই ত' তাঁরই ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ

চান্দাবিলা (মেদিনীপুর)

৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মাহাতোদের অঞ্চলে আসিয়াছি। তুলনায় ইহারা সভ্যতাভিমানীদের চেয়ে ভাল। ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহার মধ্যেই বসিয়া কাল শ-পাঁচেক লোক ভাষণ শুনিল। কৃষির মরশুম চলিয়াছে। তার মধ্যে এত লোকের সমাবেশ আশ্চর্য্যজনক। কৃষির সময়ে কৃষকেরা বাপ-মা মরিলে কাষ্ঠ করিবার সময় পায় না। কোলাঘাটে কাল হাজার পাঁচেক লোক হইয়াছিল। এমন জম-জমাট সভা নাকি কোলাঘাটে আর কখনও হয় নাই। এখানে তার দশ ভাগের এক ভাগ। কোলাঘাটের আন্তরিকতা আমাকে অভিভূত করিয়াছিল, এদের দেখিলাম সরলতা। দুটাই অতি উপাদেয় বস্তু। সর্ব্বত্র আমি আন্তরিকতা আর সরলতাই দেখিতে চাহি। কোলাঘাটে ছিল উচ্ছ্বাস, তাহা অন্তরের একান্ত উপলব্ধি হইতে জাত, তাই তাহা হইয়াছিল আন্তরিক। উচ্ছ্বাসকে বন্যার সহিত তুলনা করা চলে। বন্যায় পলি পড়ে, জমির উর্ব্বরতা বাড়ায়। পলিমাটির জমিতে চাষ-আবাদ করিলে জো বুঝিয়া বীজ বুনিলে দ্বিগুণ ফসল ঘরে ওঠে। চান্দাবিলাতে উচ্ছ্বাস ছিল না কিন্তু মানুষগুলি অতি সরল বিশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছে। দীক্ষার ঘরে যে শতাধিক ব্যাকুল প্রার্থীকে দেখিলাম, তাহারা সত্যই বিশ্বাস করে দীক্ষা নবজন্ম। কিন্তু বিশ্বাস করিলেই ত' হইবে না, কাজও করা

চাই। ইহারা যদি সাধন করিয়া যায়, তবেই আমার এই দুই দিনের শ্রম হইবে সফল।

অনেকেই বোঝে না যে, পথশ্রম বলিয়া একটা জিনিষ আছে। আজ দুপুরে চান্দাবিলা, রাত্রে পুপুন্‌কী আশ্রম, আটচল্লিশ ঘণ্টা পার না হইতেই আবার চল কলিকাতা, এভাবে জীবন ভরিয়া ভ্রমণ করিতে হইলে সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা প্রত্যাশা করা অনুচিত নহে। কিন্তু এই জিনিষটাই যে তোমাদের নাই বাবা। আন্তরিকতা আছে, সরলতা আছে, ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সাধুতে আছে শ্রদ্ধা কিন্তু নাই সময়ানুবর্ত্তিতা, নাই শৃঙ্খলা। জীবে প্রেমও তোমাদের আছে কিন্তু সেই প্রেমকে বিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ রাখিবার জন্য যে সংযমানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন, তাহার ঘটিতেছে অনটন। তাই তোমরা জীবনের সহস্র কর্ম্মে স্বাদের অভাব বোধ কর, তাই তোমরা কর্ম্মকে ফাঁকী দিয়া ধর্ম্মার্জ্জনের দিকে আকৃষ্ট হও। কিন্তু কর্ম্মকে ফাঁকি দেওয়া যে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া, তাহা কে বুঝিবে?

পুনরপি আশিস নিও। তোমাদের গঠিত মণ্ডলীটী যাহাতে জীব-প্রেম-প্রসারণে সফল হয়, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী আশ্রম

৯ই শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জগতে মাতা এবং পিতার মত গুরু নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি অজ্ঞ বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে অলব্ধপ্রবেশ হন আর তাঁহাদের প্রাণে যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে যে কৃতবিদ্য পুত্রই এই বিষয়ে তাঁহাদের সহায়তা করুক, তাহা হইলে পুত্রের পক্ষে এমন গুরুজনকে ভগবানের উপাসনা সম্পর্কিত স্তোত্রাদি, এমন কি ইষ্টমন্ত্র পর্য্যন্ত, শিক্ষাদান চলিতে পারে। তবে এমন কার্য্য দুর্ব্বিনীত পুত্রের পক্ষে সম্ভব নহে, পিতামাতার প্রতি অশেষ ভক্তিমান্ পুত্রের পক্ষেই মাত্র ইহা সম্ভব।

তোমার মাতা যখন দীক্ষামন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন ইহা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার অধিকার আমি তোমাকে অর্পণ করিতেছি।

এমন একটা নামী সমাজ-কল্যাণ-মূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছ আর নিজ উপাসনার কার্য্যটুকু নিরিবিলি করিবার মত কোনও স্থান নাই, ইহা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। "জনসেবা" "জনসেবা" বলিয়া যাঁহারা অত কলকণ্ঠ, তাঁহাদের বুদ্ধিতে এই কথাটুকুর স্থান থাকা উচিত যে, যেই সকল কর্ম্মী জনসেবা করিবে, তাহাদের অন্তরের উদ্যমের ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবার জন্য পরমশক্তির অশেষ আধার শ্রীভগবানের সহিত প্রত্যহ কিছু কিছু সময় যুক্ত

থাকিবার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন আছে। লোককে এক বিন্দু ঔষধ দিলেই জনসেবা হয় না, সেই ক্ষুদ্র বিন্দুটীর সহিত প্রাণভরা প্রীতি, স্নেহ, আত্মীয়তাও প্রদত্ত হওয়া চাই। লোককে অম্বর চরকা শিখাইলেই জনসেবা হইবে না, শিখাইবার কালে পূর্ণ আত্মীয়তার মধুর স্পর্শটুকু দেওয়া চাই। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে নিজের পরমাত্মীয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ যোগ রক্ষা করিয়া যাইবার যোগ্যতা আহরণের জন্য দিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সময়ে একটু নিরিবিলি বসার অনুশীলনের দ্বারা। কাল রাত্রি দশটায় পুপুন্‌কী পৌছিয়াছি আজ রাত্রি দশটায় বসিয়া তোমার নিকট পত্র লিখিতেছি। এই সময়টুকুর মধ্যে আমি তেরো ঘণ্টার বেশী মাঠের কাজ করিয়াছি কিন্তু কোদাল ফেলিতে, শাবল মারিতে একবারও যাহাতে ভগবানের নাম ভুলিয়া না যাই, তাহার চেষ্টা করিয়াছি! এই চেষ্টাটা আমাকে চেষ্টা করিয়া করিতে হয় নাই, এই চেষ্টাটা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই আপনা আপনি চলিয়াছে। ইহার অনুরূপ একটা অবস্থা প্রত্যেক কর্ম্মীর প্রয়োজন। চরকা বেচিবার কালেও, সূত কাটিবার কালেও, মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করিবার কালেও, রোগী শুশ্রূষা করিবার কালেও, মৃতদেহ দাহ করিবার কালেও। এইজন্যই নিরিবিলি সাধনের জন্য স্থান প্রয়োজন। তোমাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে দাবী কর যে, প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আহারের জন্য তোমাকে যেমন খাবার ঘরে গিয়া বসিতে হয়, তেমনি ভগবচ্চিন্তা ভগদ্‌ধ্যান করিবার জন্যও তোমার একটা ঘর চাই। ভগবদুপাসনা প্রাণের আহার।

অগত্যা তুমি শিয়রের কাছে বিগ্রহ রাখিয়া বিছানায় বা চৌকীর

উপরে বসিয়া উপাসনা করিতে পার। তাহাতেই বা কাজ আটকাইবে কেন? পুষ্পবিল্বপত্রাদি সহযোগে বিগ্রহে অঞ্জলি দিতে পার না বলিয়া দুঃখ করিতেছ? পুষ্প-চন্দনের ত' বস্তু হিসাবে কোনও যোগ্যতাই নাই। তাহারা ভাবের প্রতিনিধি ও দ্যোতক। তাই ত' তাহাদিগকে অঞ্জলি ভরিয়া লোকে অর্চ্চ্য বিগ্রহে প্রদান ক'রে। ফুল কত সুন্দর, আমি সুন্দর হইয়া নিজেকে প্রভুর পায়ে সমর্পণ করিব। বিল্ব-তুলসী কত সুগন্ধি, আমি সৌরভময় হইয়া তাঁহার চরণে আত্মদান করিব। চন্দন নিজেকে ক্ষয়িত করিয়া দিব্য গন্ধ বিস্তার করিতে করিতে প্রভুর পূজায় লাগে, আমিও তাঁর কাজে নিজেকে নিয়ত ক্ষয় করিয়া সার্থক হইব। এই ভাবের দ্যোতক বলিয়াই পুষ্প-বিল্বপত্র-চন্দনাদির এত সমাদর।

তুমি এই ভাবগুলি অন্তরে রাখিয়া মানস অঞ্জলি দিবে। প্রয়োজন স্থলে যেমন মানস স্নান করিয়া উপাসনা চলে, অঞ্জলিও তুমি তদ্রূপ করিবে।

সমবেত উপাসনাদির সময়ে পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া বসিতে নির্দ্দেশ দিয়াছি। তাহার কারণ এই নহে যে, পশ্চিম দিকে বা দক্ষিণ দিকে পরমেশ্বর নাই। পরমেশ্বর তোমার ভিতরেই রহিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার কর্ত্তব্য অন্তরাস্য হইয়া উপাসনা করা। সেই অন্তরাস্য ভাবকে জাগ্রত করিবার জন্যই, যে দিক হইয়া বসিলে উপাসনা প্রশস্য বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে প্রথা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে স্বীকার করা। দিক্‌টা বড় কথা নহে, কোনও নির্দ্দিষ্ট দিকে মুখ রাখিয়া অতীতে বহুজন অন্তরের যে অন্তর্ম্মুখতা সাধন করিয়াছেন,

তাহাকে নিজ অনুশীলনে আনাই বড় কথা। তুমি ইচ্ছা করিলে পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়াও উপাসনা করিতে পার, ইহাতে আপত্তির কিছুই নাই। ভগবান্‌কে ডাকিবে, যেদিকে তাঁহাকে অনুভব করিবে, সেই দিকেই মুখ রাখিবে। পূর্ব্বপশ্চিমে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত প্রীত ও তৃপ্ত হইলাম। আমার তৃপ্তির প্রধান কারণ এই যে, তুমি তোমার সহকর্ম্মীদের দোষ উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা কর নাই। বরঞ্চ তুমি এবং তাহারা যাহাতে দোষমুক্ত হইয়া চলিতে পার, তোমাদের চেষ্টা, আচরণ ও রীতিনীতি হয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সেই প্রার্থনাই করিয়াছ। অনেক কাল ধরিয়া পরস্পরের প্রতি অভিযোগপূর্ণ অনেকের অনেক পত্র অনেক স্থান হইতে পাইয়া আসিতেছি কিন্তু যাহার সহিত মতানৈক্য হইতেছে, তাহার সম্পর্কে এমন প্রেমপূর্ণ পত্র শীঘ্র পাই নাই। এজন্য তুমি আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিও।

অনেক সময়েই মতানৈক্য হয় শুধু বুঝিবার ভুলে। তাহা নিয়া মনোমালিন্য হইবে নিত্যন্ত মূর্খদের। কিন্তু তোমরা অধিকাংশেই

অজ্ঞান। তাই মতানৈক্য দেখিতে না দেখিতে মনোমালিন্যে পরিণত হইয়া যায়। ইহার প্রতীকার প্রেম। যে যত ভালবাসিতে পারিবে, সে তত ক্ষমাশীল হইবে, সে তত সহিতে পারিবে, সে তত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিবে। যে যত প্রেমিক হইবে, সে তত সহজে অপরের ভ্রম দূর করিতে পারিবে।

ভোর বেলা উঠিয়া নগর-কীর্ত্তন করিতে চাহ, বেশ ত'। কিন্তু সেই সময়ে প্রতি জনেই স্নান করিয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইতে পারিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে তাড়াহুড়া করিয়া দন্তধাবন পর্য্যন্ত না করিয়া ঊষাকীর্ত্তনে বাহির হইয়া পড়ে, যদিও দন্তধাবন কার্য্যটা করিয়াই বাহির হওয়া উচিত। এমত অবস্থায় ঊষাকীর্ত্তন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিগ্রহে অঞ্জলি দিবার জন্য স্নাত, অস্নাত, শুদ্ধবস্ত্র-পরিহিত ও অশুদ্ধ বস্ত্র অপরিত্যক্ত অবস্থায় পুষ্পাঞ্জলি হাতে লইয়া সকলে অখণ্ড-বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে, ইহা কাজের কথা নহে। অঞ্জলির আগে যার যার সংস্কার অনুযায়ী শরীর ও বস্ত্রের শুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাদের উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে, তাঁহাদেরও এই বিষয়ে লৌকিকাচারের শুচিতা রক্ষা এই জন্য প্রয়োজন যে, মহৎ ব্যক্তিদের কদাচারও লোকে অনুসরণ করিয়া থাকে।

তোমরা সকলে নগরকীর্ত্তনে বাহির হইতেছ। এই সময়ে যদি তোমাদের বস্ত্র-পরিবর্ত্তনাদি শৌচ ও শুদ্ধিমূলক কাজগুলি সম্পন্ন হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে অঞ্জলি দিয়াই বাহির হইবে বৈ কি? পল্লী বা নগর পরিক্রমান্তে পুনরায় আসিয়া অঞ্জলি দিতেও বাধা নাই।

প্রশ্ন হইবে, হরিনাম কীর্ত্তনের ফলে কি শরীর-মন শুদ্ধ হয় না? হয়, কিন্তু যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছ, সেই বস্ত্র পরিধান করিয়াই অঞ্জলি দিতে আসিলে অঞ্জলির সম্মান কমিয়া যায়। সুতরাং ইহা করিও না। পায়খানায় বসিয়াও ভগবানের নাম করা যায় কিন্তু পরমহংস অবস্থা লাভ না হইতে পায়খানায় বসিয়া বিগ্রহে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া যায় না।

কেহ কাহারও আগে জন্মগ্রহণ করিলে ভ্রাতা রূপে জ্যেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হইলেই শ্রেষ্ঠ হয় না, এইরূপ একটা কথাও একেবারে অসত্য নহে। কেহ আগে দীক্ষা নিলে পরবর্ত্তী দীক্ষিতেরা তাহাকে অগ্রজের সম্মান দিয়া থাকে। এই সম্মান দানে অনুজেরই সম্মান বাড়ে, ইহা অগ্রজের কোনও যোগ্যতার পরিচায়ক নহে। আগে দীক্ষা নিয়াছ অথচ অন্যদের অপেক্ষা সাধনে তোমার রুচি বেশী নহে, অন্যদের চাইতে তুমি শীলে, সত্যে, অনুভবে শ্রেষ্ঠ নহ, তবু তুমি দু'দশ বছর আগে দীক্ষা নিয়াছ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিবে, ইহা সঙ্গত নহে। তোমার ভিতরে সদ্‌গুণ থাকিলে তোমার দীক্ষারূপ নবজন্মের তারিখ গ্রাহ্য না করিয়াই লোকে তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে। এই কথাগুলি প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত। দীক্ষা সত্যই নবজন্ম। কিন্তু কাহার পক্ষে নবজন্ম? যে দীক্ষার পর হইতে পূর্ব্বাভ্যস্ত কদাচার পরিহার করিয়া জীবনকে সাধন-পথে চালাইবার জন্য একাগ্র চিত্তে শ্রম করিবে। লোক-দেখান একটা-দীক্ষা নিয়া ফেলিলেই কাহারও নবজন্ম হইয়া যায় না।

দীক্ষার পরে উপাসনার স্তোত্রসমূহ দ্রুত শিক্ষা করিয়া ফেলিবার

যত্ন করা উচিত। যাহারা লেখাপড়া জানে না বা কম জানে, তাহাদিগকে দ্রুত শুদ্ধ রূপে স্তোত্রাদি শিখাইবার জন্য শিক্ষিত ও অগ্রগামী গুরুভাইদের বা শিক্ষিতা ও অগ্রগামিনী গুরুভগিনীদের চেষ্টা করা উচিত। স্তোত্রগুলি কেবল কণ্ঠস্থ করিলেই হইবে না, পরন্তু যাহাতে তাহাদের উচ্চারণ সাধ্যমত শুদ্ধ হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। "সময় পাই না" বলিয়া এই বিষয়ে অবহেলা করা দোষ। যেখানে এক সঙ্গে অনেক অশিক্ষিত লোক দীক্ষিত হইয়া থাকে, সেখানে এই সকল ব্যাপারে খুবই অসুবিধা হইয়া থাকে। এজন্য সন্নিকটবর্ত্তী স্থানের মণ্ডলী হইতে শুদ্ধ উচ্চারণের মুখ-সংস্কার-বিশিষ্ট কর্ম্মীদের ঘন ঘন যাওয়া উচিত এবং যতটা সম্ভব সকলকে সহায়তা করিয়া আসা উচিত।

অখণ্ড-সংহিতা পাঠের কালে উচ্চারণ সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন কিন্তু নাটকীয় ঢং পরিহার্য্য। অধিক হাত-পা-মুখ নাড়ানাড়ি হইতে থাকিলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়েরই ধ্যানভাবের মধ্যে ফাঁকি আসিতে পারে। পাঠ সকলের শ্রুতিগম্য হওয়া চাই কিন্তু তাহা যেন অত্যুচ্চ চীৎকার না হয়। যিনি পড়িতেছেন, তিনিই যে পড়িতেছেন না, তাঁহার কণ্ঠে যে শ্রীগুরুরই বাণী নির্গত হইতেছে, এই ধ্যানটুকু বজায় রাখিয়া অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়েরই উপকার অধিক হইবে। উপাসনার অঙ্গরূপে যে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ, তাহাতে অতি দীর্ঘ সময় নেওয়া উচিত নহে আর তাহাতে আগে হইতেই অনুচ্ছেদগুলি নির্ব্বাচন করিয়া রাখা ভাল। অখণ্ড-সংহিতা পাঠের সময়কে দশ, পনের বা বিশ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না

রাখিলে উপাসনা শেষ হইতে হইতে অসম্ভব বিলম্ব হইয়া যাইতে পারে এবং ইহার ফলে নিয়মিত যোগদানকারীদের ক্রমশঃ সংখ্যা-হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। অখণ্ড-সংহিতাতে একটী তারিখে যতগুলি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সবই এক উপাসনাতে শেষ করিতে হইবে, এইরূপ জিদের কোনও সঙ্গত যুক্তি নাই।

সমবেত উপাসনায় পুরুষ ও মহিলা সকলেরই যোগদান করা আবশ্যক। কিন্তু উপদ্রুত স্থানে সন্ধ্যার পরে মহিলাদিগকে সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে বাধ্য না করাই উচিত। সকলেরই সময়-নিষ্ঠা থাকা উচিত এবং বিবাহিত ব্যক্তিদের সস্ত্রীকই সমবেত উপাসনায় আসা উচিত। উপাসনায় শান্তিভঙ্গকারী শিশুদের গৃহে রাখিয়া আসা সঙ্গত।

সমবেত উপাসনায় যোগদান করাকে একটা মহৎ ভাগ্য, একটা তীর্থযাত্রা, একটা পরম লাভজনক পুণ্য কার্য্য বলিয়া প্রত্যেকে বিবেচনা করিও। আমাকে যাহারা ভালবাস, তাহারা সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার দিনটীতে আমার সহিত একাত্মভাবে মিলিত হইবার এই সুযোগ কেহই পরিত্যাগ করিও না। অখণ্ড-সংহিতা যদি হইয়া থাকে আমার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি, তাহা হইলে জানিও যে সমবেত উপাসনা আমার সঙ্গীতময়ী মূর্ত্তি।

সমবেত উপাসনার স্থানকে অতীব পবিত্র জ্ঞান করা উচিত। এখানে জুতা নিয়া ঢোকা, বিড়ি খাওয়া, পান চিবান, চা গেলা প্রভৃতি কাজ নিবারিত হওয়া প্রয়োজন। পান, চা, বিড়ি আদির অভ্যাস যাহাদের আছে, তাহারা তাহা সমবেত উপাসনার মণ্ডপের বাহিরে

করিবে। সাধুদের দঙ্গলে আমি গাঁজার মহোৎসব দেখিয়াছি। কোথাও কোথাও উৎসব-সমারোহে তাম্রকূট-সেবনের সুব্যবস্থাও দেখা যায়। তাহার ভাল-মন্দ বিচারের প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তোমাদের অনুষ্ঠান-সমূহে ইহার পুনরাবৃত্তি অসঙ্গত হইবে। পান, তামাক, চা, চুরুটের চিন্তা উৎসব-প্রাঙ্গণের বাহিরে দোকানদারদের করিতে দাও। এই সকল বিষয় নিয়া তোমাদের কিছু করণীয় নাই।

এই সকল ব্যাপার নিয়া তোমাদের মধ্যে কোনও দলাদলি না হয়, আমি তাহাও চাহি। প্রেম ও আত্মীয়তা-বোধ থাকিলে মানুষ দলাদলিতে মজিতে পারে না। তোমরা প্রেমের অনুশীলন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র তিন দিন হয় পাইয়াছি। কিন্তু অবসর ছিল না। এই মাত্র স্থির হইল যে আজই রাত্রে দিল্লী মেইলে বেনারস যাইব। তাই কোদাল ছাড়িয়া ঘরে আসিয়াছি। এই পত্রখানা লিখিয়াই আহার সারিব, তারপরেই চাপিব ট্যাক্সিতে।

শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, অগ্রিম মোটা মোটা টাকা দিয়া বর্ষার

কৃষির জন্য যে ভৃত্যদের নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহারা এই কৃষির সময়টায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেছে। আমি কলিকাতা থাকিতেই ইহা অনুমান করিয়াছিলাম এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাও করিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে কয়েকজনকে পত্র দিয়াছিলাম। টাটানগর হইতে কেশব, বিদ্যুৎ ও অনন্ত আর বৰ্দ্ধমান হইতে নিৰ্ম্মল আসিয়া এই তিন দিন আমার সঙ্গে অসুরের মত খাটিয়া গেল। এই চারটি ছেলের অকুণ্ঠ ও পূর্ণ শ্রম ঠিক সময় মত পাওয়াতে দশ জন লোকের কাজ আগাইয়া গেল। মজুর আমি এই সময়ে মাথা খুঁড়িলেও পাইতাম না। ইহারা আসিয়া কুলীর অধিক শ্রম করিয়া শ্রমের মর্য্যদা বাড়াইয়া দিয়া গেল। ঠিক ধান্য রোপণটার সময়ে এভাবে যদি প্রতি বৎসরই তোমরা দশ বিশ জন পরিশ্রমী কৰ্ম্মী আসিয়া পুপুন্‌কী আশ্রমকে সেবা দিয়া যাইতে পার, তবে তাহা আদর্শের দিক দিয়া একটা বড় কাজ হয়। অন্য সময়ে শ্রমিক মিলে এবং জরুরী কাজ সম্পাদনের জন্য আবশ্যকীয় অর্থেরও অভাব ঘটে না। তবে, যে-ই যেখান হইতে আসিতে চাহ, পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া অনুমতি নিয়া আসিবে।

তুমি খুব দামী কৰ্ম্মী হইতে পার কিন্তু কাজের সময়ে পাওয়া গেল না। ইহাতে তোমার দাম কমিয়া গেল। সৰ্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার শ্রমদান করিয়া আদর্শের সেবার জন্য প্রস্তুত সৈন্যদল রূপে তোমরা তৈরী হইয়া উঠিতেছ কি? ইহা তোমাদের নিকটে জনসাধারণের এক দারুণ জিজ্ঞাস্য। তোমাদের মধ্যে যেমন প্রশ্ন জাগিয়াছে যে, তোমাদের আশ্রমের তরফ হইতে স্থানে স্থানে স্কুল,

কলেজ, হাসপাতাল এখনও কেন প্রতিষ্ঠিত হইল না, তেমন জাগ্রত জনমত আবার তোমাদের প্রশ্ন করিবে যে, তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ সর্ব্বশক্তি এই সকল সৎপ্রতিষ্ঠান সৃজনে নিয়োজিত করিয়াছ কি? সংসার ছাড়িয়া যাহারা ত্যাগী হইয়া আশ্রম-জীবন যাপন করিতে আসে, তাহাদের সকলেরই জীবন আরামের নহে। অন্ততঃ অযাচক আশ্রমের একটী কৰ্ম্মীও বিশ্রাম কাহাকে বলে, তাহা জানে না। এই যে বত্রিশ বৎসর ধরিয়া পুপুন্‌কীর পাথর আর কাঁকর কেবলই কাটা হইতেছে, ইহা কিসের জন্য? কোনও জনহিতকর সৎপ্রতিষ্ঠান স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাউক, তাহারই জন্য নহে কি? কাহারও কাছে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ না করিয়া নিজেদের অন্ন নিজেদের শ্রমে অৰ্জ্জন করিয়া তারপরে যাহারা পরার্থেই পরিশ্রম করিয়া যাইতেছে, তাহাদের শ্রমের পশ্চাতে যদি আরও শত সহস্র জনের স্বতঃপ্রবৃত্ত শারীরিক সহযোগও আসিয়া যায়, তাহা হইলে দূরবৰ্ত্তী লক্ষ্য কি সমীপবৰ্ত্তী প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হইতে পারে না? অযাচক আশ্রমের কৰ্ম্মীরা নানা সৎ-বাণিজ্যের মধ্য দিয়া নিজেদের শ্রমে ধন অৰ্জ্জন করিয়া তাহা এই কাজেই লাগাইতেছে, পুনশ্চ নিজেদের শারীরিক শ্রমও এই কার্য্যে অকুণ্ঠ মনে প্রয়োগ করিতেছে। ইহাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, ইহাদের আছে কেবল সেব্যরূপে জনসাধারণ। ইহা বুঝিতে এখনও তোমাদের বেগ পাইতে হইতেছে দেখিয়া কে না আশ্চৰ্য্যান্বিত হইবে?

ব্রিটিশ ত্রিপুরার রহিমপুর আশ্রমে আমি গ্রামের ধনীর দুলালদিগকে পর্য্যন্ত মাটি কাটিতে শিখাইয়াছিলাম। তাহারা পুকুর খুঁড়িয়াছিল, রাস্তা

বাঁধিয়াছিল, ইট কাটিয়াছিল, ইট পুড়াইয়াছিল। নানা বিভ্রাটে বহু লোক আজ পূর্ব্ববঙ্গত্যাগী না হইলে ঐ ক্ষুদ্র-পরিসর আশ্রমটীতে এত দিনে গ্রামের ছেলেদের শারীরিক শ্রমেই অনেক বড় এক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান দাঁড়াইয়া যাইতে পারিত। নোয়াখালীর পরশুরামে জমি সংগ্রহ হইয়া-ছিল যথেষ্ট এবং কাজও শুরু হইয়াছিল বিপুল উদ্যমে। আশ্রমের ছেলেরা এবং এমন কি কল্যাণীয়া সাধনা পর্য্যন্ত রাত্রি এগারটা তক্ সেখানে ইটের আর মাটির বোঝা বহিয়াছে। কিন্তু গ্রামের সাধারণ ভদ্রলোকের ছেলেদের মধ্যেও অধিক লোককে শ্রমদানে উদ্বুদ্ধ করিতে পারি নাই। অধিকাংশ কাজে মজুর লাগাইতে হইয়াছে। পরশুরামে ধনী বা মধ্যবিত্তের পুত্রেরা কেহই বড় একটা কোদাল ধরিতে আসে নাই। রহিমপুরে পরিচিত-অপরিচিত-নির্ব্বিশেষে মুরাদনগর হাইস্কুলের ছাত্রেরা দলে দলে আসিয়া মাটীর বোঝা মাথায় বহিয়া কাদামাখা শরীরে আমাদের সহিত উপাসনা সারিয়া ঘরে ফিরিত। কিন্তু পরশুরামের অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। সেখানে পরিচিতের পরিধির মধ্যেই মাত্র গুটিকতক উৎসাহী যুবক আসিয়া আমাদের সঙ্গে কাজে নামিত। সকলেই চাহিত কুলীরা আসিয়া শ্রমের কাজগুলি করিয়া যাউক আর কুলী-বিদায়ের টাকার জোগাড় স্বরূপানন্দ স্বয়ং করিয়া দিন। স্বরূপানন্দ তাহা করিয়াছেনও। বিস্তীর্ণ ভূমির উপরে স্থাপিত আশ্রম যেখানে যতটুকু গড়িয়া উঠিতেছিল, সবই টাকার দৌলতে আর কুলীর শ্রমে। এমন ভাবে কি কোনও আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে?

শ্রমদান এক সুমহৎ দান। শ্রমদানের অভ্যাস কুলী আর কুলীনের পার্থক্য-বোধ দূর করিয়া দেয়। তোমরা যদি দলে দলে শ্রমদানের

জন্য তৈরী হও, আমি সহরে সহরে জমি কিনিয়া বৃহৎ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সুযোগ তোমাদের দিতে পারি। কিন্তু তোমরা শ্রমদানের অনুশীলনে লাগিবে কি?

প্রায় প্রত্যেক অখণ্ডমণ্ডলী হইতেই এই একটা অভিযোগ শুনিতেছি যে, তাঁহাদের ভাণ্ডারে টাকা নাই বলিয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া উপাসনা করিতে বসিবেন এমন নিরাপদ নিরিবিলি স্থান সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। অনেক মণ্ডলী এজন্য জমি কিনিবার টাকা আমার কাছে চাহিয়াছেনও। আমার ঘাড়ে যেই সকল জরুরী কাজ ঝুলিতেছে, তাহাদের দিকে তাকাইয়া আমি এই সকল মণ্ডলীর প্রার্থনা এখনও পূরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রত্যেক মণ্ডলী নিজ নিজ এলাকার ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা বোর্ডের সহিত দরবার করিয়া এক একটা রাস্তার কতকাংশ নির্ম্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। গ্রামের বা সহরের পুকুরের পানা পরিষ্কার করিবার বা পঙ্কোদ্ধারের চুক্তি নিয়া কাজ করিতে পারেন। ইহাতে অর্থাগম হইবেই। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা করিয়া দৈনিক মোট চারি ঘণ্টা শ্রম অনায়াসে আনন্দ সহকারে তাঁহারা দান করিতে পারেন। ধনি-দরিদ্রের বিচার না করিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বালক-প্রৌঢ় সকলে মিলিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এভাবে প্রতিদিন দুই বেলা এক অপরূপ কর্ম্মোৎসবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন। এই ভাবে একটী বৎসর শ্রম করিলে প্রত্যেক মণ্ডলী নিজস্ব উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণের মাটি কিনিবার আর্থিক সামর্থ্য আপনা আপনি অর্জ্জন করিবেন।

কথাটা তোমরা চিন্তা করিবে কি?

পৌষ মাসে আমার জন্মদিনের করণীয় হিসাবে অনেক জনসভা করিয়া থাক। তাহাতে আমার স্বাবলম্বন ও অযাচক-বৃত্তির মুখরিত প্রশংসা হইয়া থাকে। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের মতন ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতের মুখ হইতে পর্য্যন্ত এই প্রশংসা-ভাষণ নির্গত হয় যে, কর্ম্মযোগে স্বাবলম্বন ও অযাচকত্বের এমন দৃষ্টান্ত নাকি ইতিহাসে আর পাওয়া যায় নাই। সেই সকল সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হইলে তোমাদের আর আনন্দের অবধি থাকে না। বক্তাদের বক্তৃতাকালে তোমাদের তুমুল করতালিধ্বনিতে তাঁহাদের কণ্ঠ ডুবিয়া যায়। কিন্তু ইহার পরে এমন প্রত্যাশা করা কি অন্যায় হইবে যে, তোমরা নিজেরা শারীরিক পরিশ্রমের লজ্জা ত্যাগ করিয়া ফেলিবে?

লজ্জা অবশ্য ত্যাগ করা যায়, যদি অন্তরে থাকে প্রেম। বাগ্‌-বাহুল্যের চর্চ্চা কমাইয়া দিয়া অন্তরে প্রেমের চর্চ্চা সুরু কর। শব্দই ব্রহ্ম কিন্তু শব্দের অপব্যবহার ব্রহ্মারাধনা নহে। বাক্যের অপব্যবহার কমাইতে হইলে অন্তরে প্রেমের অনুশীলন করিতে হইবে। তবেই ত্যাগও আসিবে, পৌরুষও আসিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের সহর এবং নিকটবর্ত্তী পল্লীগুলি আসন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের

আশঙ্কায় আতঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে। ইহাই ত' উপযুক্ত সময়, যখন হরিনামে পল্লী-নগর ভরিয়া দিতে হইবে। লোকের মনকে নিয়ত আতঙ্কে ডুবিয়া থাকিতে দেওয়ার মতন সর্ব্বনাশা অবস্থা কি আর কিছু আছে? সকল সবল-হৃদয় কর্ম্মীদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ কর। প্রতিজনকে বল, হরি-নামের বন্যায় লোকের মনের ভয়-বিহ্বলতা দূর করিতে হইবে। এই সময়ে তোমরা অলস জল্পনায় কাল কাটাইয়াও না।

তোমার গুরুভ্রাতা শ্রীমান চ—র পত্রখানা পাঠাইলাম। দেখা যাইতেছে, আর্থিক ব্যাপারে একে অন্যকে অসৎ ভাবিয়া এক তুমুল কলহ সৃষ্ট হইয়াছে। হয়ত কোনও পক্ষই অন্য পক্ষকে ঠকাইতে চাহে নাই। হয়ত মাত্র বুঝিবার ভুলে এত বড় একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, হয়ত এক পক্ষের কিছু গলদ আছে এবং সেই স্বল্প গলদকেই বেশী করিয়া দেখা হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, এক পক্ষ নিজের ক্ষুদ্র গলদ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য অপর পক্ষের স্কন্ধে বৃহত্তর এক কল্পিত গলদের বোঝা আনিয়া চাপাইয়া দিয়াছে। ব্যাপার প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাই হইয়া থাকুক, তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়া অবিলম্বে এই কলঙ্ককর কলহ মিটাইয়া দাও।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ অতি আত্মনাশা ব্যাপার। ভ্রাতায় ভ্রাতায় দ্বন্দ্ব দেখিলে নিরীহ স্বভাবের সৎলোকেরা সেই সঙ্ঘের ছায়া মাড়াইতে সাহস পান না। "দূরে ছিলাম, বেশ ছিলাম, উহাদের সঙ্ঘে ঢুকিয়া পড়িয়া শেষে ঝগড়া-কলহ করিয়াই দিন কাটাইব নাকি?"—এইরূপ যুক্তি-বিচার করিয়া তাঁহারা সেই সঙ্ঘকে পরিহার করিয়া চলেন। তোমাদের সহরে আদর্শপ্রচারাত্মক বিরাট বিরাট কার্য্য

তোমরা করিয়াছ, যাহার সহিত তুলনীয় কোনও সমকক্ষ অনুষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও মহা-প্রতিষ্ঠাবান্ সঙ্ঘও করিতে পারেন নাই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিবে যে, সহরের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীর লোক ছাড়া প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিক ধীমান পুরুষ তোমাদের সঙ্ঘের সহিত যুক্ত হন নাই। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ যে তোমাদের মধ্যে আত্মকলহ ও আত্মদ্রোহকর নানা অপপ্রয়াস, একথা অস্বীকার করিবে কি করিয়া? সবাই বলিতেছেন, তোমাদের সংঘ বৃহৎ, সবাই স্বীকার করিতেছেন, তোমাদের আদর্শ অতীব মহান্, সবাই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন যে সামান্য সম্বলে তোমরা এক একটা মহাকীর্ত্তিকর কার্য্য সম্পাদন করিতেছ কিন্তু কেহই তোমাদের সংঘের ছায়ায় আসিয়া প্রাণ জুড়াইতে চাহিতেছেন না। চাহিবেন কি করিয়া? তোমরা যে সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়া নিজেদের মধ্যে আবার অসামান্য কলহও করিয়া যাইতেছ!

সুতরাং যেখানে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দেখিতে পাইবে, অঙ্কুরেই তাহাকে নাশ করিতে হইবে। এজন্য চাই প্রেমময় প্রাণ, স্নেহময় হৃদয়, করুণাময় নয়ন, ক্ষমাময় বিচারবুদ্ধি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জনৈক শিষ্যের লিখিত একখানা পত্র পাঠ করিতেছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, সাধু-সঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু যে সাধুর সঙ্গ করিলে ইষ্টে, গুরুতে, সাধনে এবং মন্ত্রে দ্বিধা-সংশয় আসে, তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করা কর্ত্তব্য, তাঁহার নিকট উপদেশ শুনিবার জন্য না যাওয়াই কর্ত্তব্য। কেন কর্ত্তব্য? না, যিনি সাধনে, মন্ত্রে, গুরুতে সংশয় সৃষ্টি করেন, তিনি সুজন হইলেও দুর্জ্জনের কাজ করিয়া থাকেন, দুর্জ্জনকে বর্জ্জন করাই আর্য্য পন্থা। কাহারও ফোঁটা-তিলক দেখিয়া, কাহারও মহুর্মুহুঃ ভাবও অন্তর্বাহ্যদশা দেখিয়া, কাহারও লোক-প্রতিপত্তি শুনিয়া, কাহারও অলৌকিক ক্ষমতা আছে জানিয়া তাঁহার নিকট লোকেরা অনেক কিছু প্রত্যাশা নিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। তারপরে যদি লাভ হয় গুরু, মন্ত্র ও সাধনে অবিশ্বাস, তবে ত' খুব মস্তবড় ক্ষতিই হইল।

সমাধি আর সমাধির অভিনয় এক জিনিষ নহে। একজন শিশির ভাদুড়ী বা ছবি বিশ্বাস সমাধির যে অভিনয় করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় প্রকৃত সমাধিবান্ পুরুষেরও কল্পনার অতীত। কিন্তু সমাধিবান্ পুরুষেরা কখনও কাহারও মত-পথে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি করেন না। সমাধিবান্ পুরুষদের এমন অনেক ছোট ছোট বিষয়ে একেবারেই লক্ষ্য থাকে না, যেই সকল বিষয়ে নিষ্প্রয়োজনীয় অভিনিবেশ সমাধিবান নামে খ্যাত অনেক সাধু-সজ্জনদের মধ্যে প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। সমাধিবান্ পুরুষের উচ্চনীচে ভেদ-বুদ্ধি থাকার কোনও সঙ্গত কারণ দেখি না।

প্রেম-সহকারে নিজের সাধনই করিয়া যাও, অন্য দিকে মন দিও না। তুমি যদি আমার নিকট দীক্ষিত সাধক হইতে, তাহা হইলে এই মনোবিচলন দেখিয়া আমি এক কথায় তোমাকে আদেশ দিয়া দিতাম যে, যাও, ঐ সমাধিবান্ পুরুষেরই কাছে নূতন করিয়া দীক্ষা নিয়া একবার পরখ করিয়া দেখ যে, শিষ্যের মধ্যে শক্তি-সঞ্চারের নাম করিয়া কি কি নূতন বস্তু তোমাকে তিনি দিতে পারেন। কিন্তু তুমি অন্যত্র দীক্ষিত। তোমাকে কোনও বিপজ্জনক পরীক্ষায় অগ্রসর হইতে প্ররোচনা বা প্রবর্ত্তনা আমি দিতে পারি না। সেই জন্যই বলিতেছি, প্রেম সহকারে গুরুদত্ত সাধন করিয়া যাও। হুজুগে পড়িয়া গুরুদত্ত সাধনে অবহেলা করা বা উদাসীন হওয়া একটা নিদারুণ রকমের মূর্খতা। সাধন করিতে ভাল লাগে না বলিয়া বসিয়া কালহরণের মতন পাপ আর কিছু নাই। "আমার গুরু আমাকে যে সাধন দিয়াছেন, তাহার চাইতেও কত ভাল সাধন না-জানি অন্য আর এক জন গুরুর কাছে আছে", ভাবিয়া দুয়ারে দুয়ারে সাধন চাহিতে যাওয়া এক নিদারুণ মতিভ্রম। সেই পথে তুমি পদচারণা করিও না। ভগবানের সহিত জীবের সম্পর্ক একেবারে সোজাসুজি এবং প্রত্যক্ষ,— ইহা পরোক্ষও নহে বা মধ্যবর্ত্তী দালালদের কমিশনের উপরেও নির্ভরশীল নহে। লোহা বা সিমেন্টের পারমিটের ন্যায় ইহাতে মধ্যবর্ত্তী চতুর সুকৌশলীদের উপরি পাওনার ব্যবস্থাও কিছু নাই। সুতরাং দশ দিকে মন দিয়া বিভ্রান্ত না হইয়া একমনে গুরুদত্ত সাধন করিয়া যাও। নিজেকে সাধন হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিচ্ছিন্ন হইতে দিও না। তোমার সাধন-নিষ্ঠার মাঝখানে কোনও দুর্ব্বলতাকে প্রবেশ

করিতে দিও না। ভগবানের নাম সর্ব্বাবস্থাতেই সত্য। সেই সত্যকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক।

অনেকে নিজেকে অবতার বলিয়া পূজিত করিবার জন্য মিথ্যা দলিল সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং কখনো নিজেকে বিষ্ণুর, কখনো শ্রীগৌরাঙ্গের, কখনো বা শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার বলিয়া যুগপৎ প্রচার করিয়া থাকেন। এই সকল প্রচারের পিছনে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিগণ পৃষ্ঠাপোষকরূপে দণ্ডায়মান থাকিলে সাধারণ বুদ্ধির লোকেরা ইহাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লয়। সম্প্রদায়-বিস্তারের পক্ষে ইহা এক চমৎকার উপায়। সরল সহজ ধর্ম্মপ্রচার-বুদ্ধি যখন জগদ্ব্যাপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় বিস্তারের উৎকট আগ্রহে রূপান্তরিত হয়, তখন সিদ্ধ, সাধক বা উন্নত কোনও মহাপুরুষকে ভগবানের অবতার রূপে প্রচারিত করিবার আগ্রহটাও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রবল হয়। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের জীবৎকালে অসংখ্য স্থানে দর্শন করিলাম। মানুষ ভগবানের অবতার হইয়া প্রকাশিত হইবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্য ঘটনা নহে। ভগবানই মানুষ রূপে অবতীর্ণ হন, মানুষই ভগবান হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। ইহা হিন্দু মাত্রের পক্ষেই এক সর্ব্বজনগ্রাহ্য মহাসত্য। কিন্তু সম্প্রদায় বিস্তারের জন্য মানুষকে অবতার রূপে প্রচার করিতে গেলে মিথ্যা ঘটনা, কুযুক্তি এবং অপসিদ্ধান্তের আশ্রয় লইতেই হয়। এই সকল যুক্তি এবং সিদ্ধান্তকে ব্যাধের জাল বা শিকারীর ফাঁদ বলিতে পার। জগতে এমন চক্ষুষ্মান কয়জন আছে, যাহারা সবুজ ঘাসের অন্তরালে লুক্কায়িত জালের দড়ি দেখিতে পায়? তোমাদের অনেকের অবস্থাই তাহা হইয়াছে। যত স্থানে অবতারবাদ

প্রচারিত হইতেছে, তাহার সুপ্রকট উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে কেবল সঙ্ঘ-বিস্তার। সঙ্ঘ-বিস্তারের নানাবিধ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। সুতরাং তাহার উপর কোনও মন্তব্য প্রকাশ চলে না। কিন্তু "আমার ঠাকুর আধুনিকতম ঈশ্বরাবতার", ইহা সজোরে, সবলে, সোৎসাহে, কলস্বরে, কুণ্ঠাহীন নির্লজ্জতায় প্রচার করিবার ভিতর জগতের লাভ কোথায় আছে? কেহ অবতার বলিয়া স্বীকৃত হউন বা না হউন, তাহাতে সেই মহাপুরুষের আশ্রিত মঠ বা সঙ্ঘের বাস্তব ক্ষতি কি হইতে পারে? মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরাবতার, প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে এই কথা শুনাইয়া শুনাইয়া তাহার ভিতরের ব্রহ্মশক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিবার ভিতরে যে মহনীয়তা আছে, মঠে মঠে মন্দিরে মন্দিরে শত শত অবতারের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ও পূজা-প্রচলনের মধ্যে তাহা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতির মুহুর্মুহু ভাবসমাধি হইত। জনসাধারণের সেই সমাধির প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা আছে। ইহা দেখিয়া তুমি যদি সমাধির অনুকরণ করিতে থাক, তাহা হইলে এই বিদ্যাটা আয়ত্ত হইতে বড়-জোর এক সপ্তাহ লাগিতে পারে। এই সকল সমাধির একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ এই যে, একদিকে যেমন ঘন ঘন সমাধি হইতেছে, তেমন আবার তার ফাঁকে ফাঁকে শূদ্রকে ঘৃণা করিতেছে, স্ত্রীজাতিকে বিদ্বেষ করিতেছে, ভিন্ন মতে গৃহীত-সাধন নরনারীদের মনে বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি করিতেছে, কেহ কোনও কঠিন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কাছে আসিলে বা অপ্রিয় প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাহিলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হইয়া প্রশ্নকারীকে বেকুব বানাইয়া জব্দ করিয়া দিতেছে।

এইরূপ ঘটনা সত্য যুগেও ঘটিত, কলিযুগেও ঘটে। সুতরাং তুমি অন্য কোনও আকর্ষণেই বিচলিত না হইয়া নিজ গুরুদত্ত সাধন পূর্ণ বিক্রমে করিয়া যাইতে থাক। তাহার মধ্য দিয়াই তোমার সর্ব্বাভীষ্ট-পূরণ হইবে। জলপান করিতে হইলে ঘাটে ঘাটে নামিতে হয় না, এক ঘাটের জলেই সকল পিপাসার পরিতৃপ্তি সম্ভব। প্রেম আর পূর্ণ-শ্রম এক সঙ্গে যুক্ত হউক। কেবল শ্রম করিলেই চলিবে না আর প্রেম করিতেছি বলিয়া সাধন ছাড়িয়া দিয়া কেবল হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া চখের জলে বক্ষ ভাসাইলেই চলিবে না। ঘন ঘন সমাধি হওয়া রূপ লক্ষণও যেমন অনেক ক্ষেত্রে কপটতা-ব্যাধি মাত্র, অবিরাম চোখের জল ফেলা আর হাহুতাশ করাও অনেক ক্ষেত্রে তেমন কপটতা আর ব্যাধি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ বারাণসী

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে হতাশার সুর ধ্বনিত হইতেছে কিন্তু আমি ইহারই ভিতরে প্রভাত-পাখীর কাকলি শুনিতে পাইতেছি। আবর্জ্জনা-স্তূপেও আমি অগ্নির লেলিহান রসনা দেখিতে পাইতেছি। পূতিগন্ধ মৃত ইন্দুরের কাক-ভক্ষিত কদর্য্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আমি নূতন সুরভির সৃষ্টি-

সম্ভাবনা লক্ষ্য করিতেছি। তোমাদের ঐ উদাসীন, কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ, উচ্ছৃঙ্খল, দায়িত্ববোধহীন ছেলের দলকে কাজে লাগাইতে হইবে। এখন যাহাদিগকে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য মনে করিতেছ, তাহারা যথাকালে অভাবনীয় যোগ্যতার সহিতই কাজ করিবে। আশা রাখ, হাল ছাড়িয়া দিও না, হতাশ হইও না।

যে কাজ আশ্বিনে ধরিতে হইবে, তাহার পত্তন আষাঢ়ের প্রথম দিকেই সুরু করিতে হয়, এই অতি প্রয়োজনীয় বাস্তব সত্যকে ভুলিয়া যাইও না। সকলের অন্তরে প্রেম জাগাও। প্রেম জাগিলে কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অরুণোদয় হইতে অধিক দেরী হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভাদ্র মাসে গৃহপ্রবেশে কোনও ক্ষতি হয় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই মাসে জন্মিয়াছিলেন। চৈত্র মাসেও না। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র এই মাসে আসিয়াছিলেন। কোনও মাসই অপবিত্র বা বিপজ্জনক নহে। সব মাসই ভগবানের। ভগবানের সেবাকে লক্ষ্য করিয়া গৃহপ্রবেশ করিও, নিজের সুখ ও পরিতর্পণকে লক্ষ্য করিয়া নহে। একটী মঙ্গলবার দেখিয়া সমবেত উপাসনা করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবে।

তবে যদি নিজের অন্তরে চিরকালপোষিত সংস্কার কোনও দ্বন্দ্ব

সৃষ্টি করে, তাহা হইলে হঠকারিতা করিও না। মনের গোপন সংস্কারকে বিধ্বস্ত করিতে অক্ষম হইলে মনেরই শান্তির জন্য একটা মাস সবুর সহিয়া আশ্বিনে গৃহপ্রবেশ করিতে পার। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার প্রয়োজন নাই। মনের দিকে তাকাইয়াই এইটুকু প্রশ্রয় গ্রহণ করিতে পার।

জীবনকে ভগবানের কাজে উৎসর্গ কর। অর্থাৎ জীবনে যতগুলি কাজ করিবে, সবই ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদনের জন্য, এই ভাব রাখিয়া চলিবে। এই ভাবেই নিজেকে ভগবন্ময় করিয়া তোল। তখন আর অমাবস্যা, মঘা, ভদ্রা, অশ্লেষা প্রভৃতি কেহই তোমার কোনও কার্য্যে বাধা-স্বরূপ হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে নূতন স্থানে গিয়া পড়িয়াছ, সেখানে যদি তুমি তোমার সমভাবের ভাবুক, সমাদর্শ, সমবিশ্বাসী চরিত্রবান্ যুবকদের দ্রুত খুঁজিয়া বাহির না করিতে পার, তাহা হইলে বস্তুতন্ত্র জড়বাদী রাক্ষসদের কবলে পড়িয়া তোমাকে আর্ত্তনাদ করিতে হইবে। এমত অবস্থায় তোমার পক্ষে পরিপূর্ণভাবে প্রচারক-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাজ সুরু করা সঙ্গত হইতেছে।

নিজের প্রতি মমতা এবং আদর্শের প্রতি প্রেম, এই দুইটী নিরপরাধ প্রেরণায় কাজে হাত দাও। অপর কোনও মত বা পথকে পর্য্যুদস্ত করিবার বুদ্ধি হইতে কিছু করিও না। জগতে বহুমতের বহুপথের অস্তিত্ব কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সকল মত ও সকল পথকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজেদের মত ও নিজেদের পথকেই জগতে একচ্ছত্র করিবার কল্পনা বাতুলে সাজে। তবে জগৎ-কল্যাণের উদ্দেশ্য লইয়া ভগবানের প্রীতিসম্পাদনের সাত্ত্বিক অভিপ্রায়ে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রচারকার্য্য করিলে তাহা দোষের হয় না। জগদ্বাসীর প্রতি প্রেমই যখন একমাত্র প্রযোজক, তখন তোমার প্রচারকার্য্য তামসিকতার পরিবন্ধন হইতে মুক্ত থাকিতে বাধ্য। তখনই উহা পবিত্র ব্রত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ বারাণসী

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান হইতে আমাকে ভ্রমণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। তোমরা হয়ত স্থানগুলির নাম শুনিলে হাসিবে যে এমন সব স্থানে বাবামণি যাইবেন ধর্ম্মপ্রচার করিতে!

কিন্তু এই বিস্ময় নিরর্থক। ছোট ছোট স্থানগুলিকে উপেক্ষা করা ভুল। ছোটরাই জগতে সকলের চাইতে বড়। ইহা একটা স্বতোবিরোধী কথা বলিয়া মনে হইবে কিন্তু ইহা পরম সত্য। নিজ নিজ অন্তরে ছোটকে বড় করিয়া দেখিবার মতন অফুরন্ত প্রেমের সঞ্চারণা কর। তোমাদেরও লাভ হইবে, জগদ্বাসীও লাভবান হইবেন। ছোটরা যে কত বড়, তাহা খুব কম লোকেই জানে। তারই জন্য ছোট স্থানের অনাদর, ছোট মানুষে অবজ্ঞা, ছোট কাজে অমনোযোগ। ছোটরা ছোট নহে, তাহারা বড়র জনক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ বারাণসী

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঈশ্বর বিশ্বাস লইয়া পথ চল। নিমেষের জন্যও হতাশ হইও না। যে বিশ্বাসী, চতুর্দ্দিক হইতে তাহার সহযোগ আসিয়া যায়। বিশ্বাসে প্রেম বাড়ে, প্রেমে বিশ্বাস বাড়ে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

বারাণসী

হরি-ওঁ

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাকে সর্ব্বপ্রযত্নে কাজে লাগিতে হইবে। দীনদরিদ্র অজ্ঞ-মূর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুলী-মজুরদের ভিতরে সর্ব্ব অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাদিগকে ঈশ্বরীয় বাণী, আদর্শের প্রেরণা ও নবজীবনের সঞ্চারণা দ্বারা রূপান্তরিত করিতে হইবে। এখন তাহারা কুসংস্কারের অচলায়তনে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। সামান্য সাধনায় তাহাদিগকে জাগান সম্ভব নহে। পিশাচের নিশা-সঞ্চারণের মত তাহারা প্রেতমূর্ত্তিতে বিচরণ করিয়া সকলের ত্রাস-সঞ্চার করিতেছে। তাহাদিগকে আত্মস্থ করিতে হইবে। কিন্তু তাহার উপায় অফুরন্ত প্রেম, অনাবিল স্নেহ, অকৃত্রিম ভালবাসা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি বোঝ আর না বোঝ, আমি নিয়ত তোমার সঙ্গেই আছি। বিশ্বের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া এই একটি কথাকে বিশ্বাস

কর। এই একটি কথাতে বিশ্বাস স্থাপনের সাধনাই তোমাকে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় করিবে। আমি তোমাদের পূজা বা অর্চ্চনা চাহি না। আমি তোমাদের বিশ্বাস প্রত্যশা করি। যাহার বিশ্বাস আছে, সেই জীবিত। অবিশ্বাসীরা মৃত। মৃতদের লইয়া কোন আলোচন করিয়া কেহ সময় নষ্ট করিও না। তাহাদের নিন্দা-চর্চ্চা করিলে তাহাদেরই ধ্যান করা হয়। ইহাতে নিজেদের মধ্যে তাহাদের কুস্বভাব আসিয়া যায়। কেবল বিশ্বাসীদের দিকে তাকাও, তাহাদের স্বভাবের অনুবর্ত্তন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের প্রেমভক্তি আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। ভগবানে যাহার অনুরাগ, তাহারই মনুষ্য-জন্ম সার্থক। ভগবান বলিতে কিম্ভূতকিমাকার কোন অদৃশ্য অস্পৃশ্য অজ্ঞেয় বস্তু বলিয়া বুঝিও না। তিনি তোমাতে আমাতে সর্ব্বভূতে প্রেমস্বরূপে বিরাজমান, জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত, আনন্দস্বরূপে শাশ্বত। এই জ্ঞান, এই প্রেম, এই আনন্দকে দর্শন করাই ভগবদ্‌-দর্শন। ভগবানকে দেখা যায়, তাঁহার কথা শুনা যায়, তাঁহার অঙ্গস্পর্শ লাভ করা যায়—ইহা কবি-কল্পনাও নহে, হেঁয়ালিও নহে। নিজেকে সত্য বলিয়া জান, গুরুকে সত্য বলিয়া

বিশ্বাস কর, নামকে পরম সত্যের অভিন্ন মূরতি বলিয়া গ্রহণ কর।

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে দ্বন্দ্ব-কলহ চলিয়াছে, তাহা আমাদের জন্য নহে। আমরা সর্ব্বসম্প্রদায়ের অর্চ্চনার ভিতরে আমাদেরই পরমপ্রভুর অর্চ্চনাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। যেখানে প্রেম, সেখানেই তিনি। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই তিনি। যেখানে আনন্দ সেখানেই তিনি। তাঁহাকে ছাড়া কেহ নাই, কেহ ছিল না, কেহ থাকিবে না। নিখিল বিশ্বে ইহা অনন্ত কোটি সত্যেরও পরম সত্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। একনিষ্ঠার চেয়ে বড় সদ্‌গুণ সাধক-সাধিকার পক্ষে আর কিছু নাই। হাজার দেবমূর্ত্তির পূজা না করিয়া একটীতে মন বসাও। তাহাতে সকল দিক দিয়া কুশল হইবে। আমি কোনও মতের কোনও পথের সাধন-পদ্ধতির প্রতিই শ্রদ্ধাহীন নহি। কিন্তু একনিষ্ঠার চাইতে বড় সহায় যে সাধন-জীবনে আর কিছু নাই, ইহা মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঋণ করিবার স্বভাব বড় খারাপ। একবার ঋণ করার অভ্যাস হইলে আর বিনা ধারে কাজ করা যায় না। এমন পাপ অভ্যাস কাহারও করা উচিত নহে। অতীতে যত কাজ যেরূপ আড়ম্বরে করিয়াছ, এখন তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাও। সংসারের প্রতিটি কর্ত্তব্য কার্য্য মিতব্যয়িতার মধ্য দিয়া করিতে থাক। ইহাতে লোকের কাছে যশ বা প্রতিপত্তি কমিতে পারে কিন্তু তোমার সাধনের যোগ্যতা বাড়িবে। ঋণভার-পীড়িত মন ইষ্টচিন্তায় সহজে নিবিষ্ট হয় না। এই কারণে আধ্যাত্মিক উন্নতিলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রেই অঋণী থাকিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

নিজে যেমন ঋণ গ্রহণ করিয়া মনের শান্তি নাশ করিবে না, অন্যকেও তেমন অঋণী থাকিবার জন্য সর্ব্বদা সহায়তা করিবে। কম খাইয়া, কম পরিয়া, কম আরাম করিয়াও অঋণী থাকা শ্রেয়ঃ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ধৃতং প্রেম্না

(৩৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সাধন-ভজনের অভ্যাসকে একেবারে স্বাভাবিক ও সরল করিয়া ফেল। চলিতে বসিতে খাইতে শুইতেও যেন মনে মনে সাধন চলিতে থাকে। ইহা সামান্য চেষ্টার ফলেই হইয়া থাকে। অনেক সাধারণ লোকের জীবনেই ইহা সত্য হইয়াছে। তোমাদের পক্ষে ইহা অসম্ভব হইবে কেন?

সুগভীর বিশ্বাস, সুনিবিড় নিষ্ঠা এবং প্রাণভরা প্রেম নিয়া ভগবানের নামের সাধন করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২রা ভাদ্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই কুটিল সংসারে সরল ভাবে কাজ করা বড়ই কঠিন। লোকের সরলতার সুযোগ নিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য এত লোক ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে যে, সাবধান হইয়া চলিতে না

পারিলে প্রতিপদে একটা না একটা বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা অথচ প্রত্যেক ঝোপের পিছেই বাঘ আছে, এমন সন্দেহ লইয়া পথ চলিতে গেলে জীবনের অগ্রগতি মন্থর হইয়া যায়।

এই জন্যই সাধকমাত্রের পক্ষেই পরম উপদেশ এই যে, পরমেশ্বরে নিজের ভক্তি ও বিশ্বাসকে প্রগাঢ় করিয়া পথ চল। বিপদ আসিলে তাহার মধ্য দিয়াই পথ চলিতে হইবে, থামিয়া থাকিলে চলিবে না। কুটিল লোকের সংস্পর্শে আসিয়া পড়িলেও তাহার ধ্যান না করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যানই অন্তরে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। প্রেম-সহকারে নিয়ত ভগবান্‌কে স্মরণ কর, —বেচালে পা পড়িবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন দায়িত্ব ও নূতন কর্ত্তব্য তোমাকে নবতর অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য ডাকিতেছিল। তুমি মনে করিয়া বসিলে যে, ইহা তোমার বর্ত্তমান কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ও তোমার প্রতি অবিশ্বাস। বড় হইবার সুযোগকে যাহারা এই ভাবে অবহেলা করে, বল, তাহারা বড় হইবে কিসের বলে?

যেখানে বসিয়া এতকাল কাজ করিতেছ, সেখানে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় অল্পই দিতে পারিয়াছ। তোমার কৃতিত্ব-প্রকাশের এই সুযোগের অভাবকে তুমি ব্যাখ্যা দিয়াছ তোমার স্বাধীনতার উপরে অপরের হস্ত-ক্ষেপের কুফল বলিয়া। কিন্তু যখন অন্যত্র নিজের স্বাধীন দায়িত্বে কাজ করিবার আহ্বান আসিল, তখন কেবল নিজেই তাহার প্রতিবাদ করিলে না পরন্তু স্বনামী ও বেনামীতে নানা জনের পত্র দ্বারা আমাদের ইহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইলে যে, যেখানে তুমি আছ সেখানে চমৎকার কাজ তুমি করিতেছ, অন্যত্র তোমাকে যাহাতে যাইতে না হয়, তাহার জন্য তুমি আরও ভাল ভাবে থাকিতে ও আরও সুন্দর ভাবে কাজ করিতে চেষ্টা করিবে।

তুমি কিন্তু আদৌ বুঝিতে পার নাই, এভাবে নিজেকে সেই পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রেই যুক্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টার ভিতরে তোমার কত বড় অযোগ্যতাটা প্রমাণিত হইয়া গেল। তুমি নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে যাইয়া কাজ করিতে সাহস পাও না। তুমি নূতন দেশে নূতন লোকদের মধ্যে গিয়া নিজেকে জনসেবায় সমর্পণ করিয়া দিবার ব্যাপারে আগ্রহী নহ। তুমি এত দিনের পরিচিত লোকগুলির সহিত এমনই বন্ধুত্বের নিগড় সৃষ্টি করিয়া লইয়াছ, যাহা তোমাকে স্বাধীন হইয়া বাহিরে যাইতে দিতেছে না। বন্ধুরা তোমাকে বন্ধন করিয়াছে।

এই সকল দোষ এবং অসম্পূর্ণতা তোমার বর্ত্তমান মনোভাবের মধ্য দিয়া ধরা পড়িয়াছে।

এগুলির তুমি সংশোধন করিতে যত্নবান্ হও।

কাজ করিলেই তাহাকে কর্ম্মী বলে না। তাহাকে অনাসক্ত

হইতে হইবে। আশ্রমে বাস করিলেই তাহাকে আশ্রমী বলে না, প্রয়োজন হইলে নিত্য নূতন স্থানে যাইয়া নবতর কর্ম্মক্ষেত্রসমূহ তাহাকে সৃজন করিতে হইবে। নূতন লোক, নূতন দেশ, নূতন পরিস্থিতি, নূতন কর্ম্ম-তালিকাকে ভয় করিলে চলিবে না। জগতে নূতনেরই জয়জয়কার। যে নূতনের ভিতরে শাশ্বত সত্য নিত্য বর্ত্তমান, তাহার জয় অবধারিত। মনে হয়, তুমি আশ্রমেই বাস করিতেছ কিন্তু আশ্রমী হও নাই।

অন্তর-ভরা প্রেম থাকিলে সত্য সত্য আশ্রমী হওয়া যায়। প্রেমিক ভয়কেও জানে না, লজ্জা-সরমেরও ধার ধারে না। সে জীবনকল্যাণের পবিত্র যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। আমি চাহি, তোমরা তাহাই হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ কলিকাতা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি লিখিয়াছ যে, স্বাধীনতা-উৎসবের দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য তোমাদের যাওয়া প্রয়োজন, সেইদিন প্রাতে আটটায় সমবেত উপাসনা থাকিলে কি করিয়া চলিবে? তৎসম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যাহাদের জরুরী প্রয়োজন, তাহারা পতাকা উত্তোলন করিতে

যাইবে। কিন্তু এমন একটী স্মরণীয় দিনে আমরা সমবেত উপাসনা করিব না, ইহা হইতে পারে না। আসলে হয়ত ভারত স্বাধীন হয় নাই। প্রকৃত স্বাধীনতা আসিলে স্বাধীনতা-দিবসে ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে পূজা, অর্চ্চনা, উপাসনাদিই হইত। পতাকা উত্তোলনের সহিত তাহার বিরোধ কোথায়?

লোকে ধারকর্জ্জ চাহিলেই টাকা দিতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই বাবা। ধারকর্জ্জ দিলে বরং অনেক ক্ষেত্রে অযথা বন্ধুত্বহানি হয়। আমার মত বিত্তহীন লোকের কাছেও অনেকে ধারকর্জ্জ চাহে। টাকা থাকিলে আমি প্রত্যর্পণের আশা না রাখিয়াই দিয়া দেই এবং জীবনে আর তাগাদা করি না। একদল লোকই আছে, যাহারা কাহার হাতে টাকা আছে জানিলে শকুনের মত গিয়া তাহাদের উপরে ছোঁ মারিয়া পড়ে এবং নিষ্প্রয়োজনেও ধারকর্জ্জ করে। কারণ, ইহাদের স্বভাবে ফেরৎ দিবার বালাই নাই। কাহারও কাহারও দুই তিন বার ফেরৎ দিবার পরে তৃতীয় বা চতুর্থ বারে গভীর জলে ডুব দেওয়ার রীতি। এই সব লোক চিনিয়া যদি চলিতে না পার, তাহা হইলে বৃথাই সংসারী হইয়াছ। আমার মত কৌপীনধারী সন্ন্যাসী হইলে কর্জ্জ দিয়া আর ফেরৎ পাইবার প্রয়োজন থাকে না। তোমার সংসার আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, তুমি লোককে বেহিসাবী সাহায্য করিতে পার কিনা সন্দেহের বিষয়। অবশ্য, প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি নিজ-বলে অভাব বিদূরণের চেষ্টায় যত্নবান্ আছে জানিলে তাহার স্বাবলম্বনী বৃত্তিকে উৎসাহিত ও সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ধার দিয়া তাহাকে সহায়তা করিতে নিয়তই প্রস্তুত থাকিও।

আমার বা তোমার হাতে অর্থ আছে, এই কথার মানে কিন্তু ইহা নহে যে, এই অর্থের আমি বা তুমি মালিক। তোমার বা আমার নামে কিছু সম্পত্তি ক্রয় করা আছে, ইহারও অর্থ এই নহে যে, ইহা নিঃশেষে তোমার বা আমার। এই অর্থ বা সম্পত্তি হইতে তোমার-আমার প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটাইবার অধিকার আমাদের আছে কিন্তু ইহার অতিরিক্ত সব নিখিল জগতের সকল প্রাণীর জন্য। যাহাতে জগতের সকলে এই অর্থ বা সম্পত্তি হইতে লাভবান হইতে পারে, তৎসম্পর্কে প্রকার-নির্দ্ধারণের অধিকার তোমার বা আমার নিশ্চয়ই আছে, কারণ তুমি বা আমি ইহা পরিশ্রম করিয়া অর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু এই অর্থকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ইহা উপলক্ষে নিজেকে নিদারুণ বিষয়ী করিয়া তোলা তোমার বা আমার পক্ষে সঙ্গত নহে। বিত্তের অধিকারী হইয়াও কি করিয়া নির্বিত্তক থাকা যায়, তাহা খুঁজিয়া বাহির করাই সংসারের প্রতি জনের কর্ত্তব্য।

কিন্তু একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানই এই কর্ত্তব্য পালনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক নহে। বিশ্বের সকলের প্রতি অন্তরের সুগভীর প্রেমানুশীলন ও প্রেমানুভূতি থাকিলেই ইহা সহজে সম্ভব। যত পার উপার্জ্জন কর, যত পার জীবের প্রতি প্রেমিক হও, প্রেমানুশীলনের জন্য সঙ্গত পরিমাণ অর্থ সুসঙ্গত পথে দানও কর, কিন্তু অর্থের, বিত্তের, বিষয়ের অপচয় করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২রা ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এবার তোমরা কয়েকজনে কৃষির সময়টাতে পুপুন্‌কী আশ্রমে আসিয়া কয়েকদিন শ্রমদান করিয়া গিয়াছ। আমি আশায় আছি যে, আগামী বর্ষায় ধান্য-রোপণের সময়ে পুনরায় তোমরা অধিকতর সংখ্যায় সেখানে যাইবে এবং শ্রমদান করিয়া নিজেদের অন্তরও আনন্দে তৃপ্তিতে ভরিয়া আনিবে, আশ্রমেরও দ্রুত-সমাপ্য কাজগুলিতে সহায়তা করিবে।

বাংলা ১৩৩৭ সালের শীতে আমি ব্রিটিশ ত্রিপুরার রহিমপুরে যাই। তখন আমি সম্বৎসরের জন্য মৌনব্রত পালন করিতেছি। রহিমপুর গিয়াই আমি ধনীর দুলালদিগকে মিথ্যা সম্ভ্রমজ্ঞান পরিহার করিয়া মাটি কাটা, ইট কাটা, পুকুরের পানা পরিষ্কার করা, রাস্তাঘাট তৈরী করা প্রভৃতি কাজে লাগাইয়া দেই। আমি নিজেও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাতীত কঠোর শারীরিক শ্রম করিয়া যাইতে থাকি। আশ্রম বা জনসাধারণ হয়ত আর্থিক ভাবে ইহাতে খুব বেশী লাভবান্ হন নাই কিন্তু জন-কল্যাণ-কর্ম্মে হস্ত-প্রয়োগের সফল দৃষ্টান্ত হিসাবে ঐ সময়ের প্রতিদিনকার কাজ সর্ব্বসাধারণের নিকটে দৃষ্টান্ত-স্থানীয় হইয়াছিল। ইহার প্রেরণা অনেক দূরদূরান্তরে ছড়াইয়াছিল, অনেক পল্লীতে আপনা-আপনি তরুণ কিশোরেরা নিজ নিজ গ্রামের

বা পাড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনহিতমূলক নবগঠিত প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিবার কাজে দলে দলে তরুণ কিশোরদের ডাকিয়া আনিতে শুরু করিল। সমগ্র ত্রিপুরা জেলা জুড়িয়া কি যে এক অদ্ভুত ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইয়া গেল, তাহার বিবরণ কোনও কবি বা লেখক হয়ত কখনো লিখিবেন না। কিন্তু হাজার হাজার নরনারীর অন্তরের চিত্রপটে তাহা অবিস্মরণীয় আলেখ্য রূপে আজ দেশ-ব্যবচ্ছেদের পরেও জাগরূক হইয়া আছে।

রহিমপুরে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, নোয়াখালীর অন্তর্গত পরশুরামে তাহা সম্ভব হয় নাই। এখানে আমি স্থানীয় কিশোরদিগকে ব্যাপক ভাবে শ্রমদান-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারি নাই। আশ্রমে আসিয়া শ্রম করিয়া যাওয়ার রুচি অল্প কয়েক জনের মধ্যেই জাগিয়াছিল এবং তার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকেরই উদ্দীপনা স্থায়ী হইয়াছিল। ইট কাটিতে হইয়াছিল কুলীর দ্বারা, মাটি কাটাইতে হইয়াছিল চুক্তির মজুরের দ্বারা। আজ দেশ-ব্যবচ্ছেদের পরে রহিমপুরও যাহা, পরশুরামও তাহা। কিন্তু দুইটীর স্মৃতির সুরভি সমান নহে।

পুপুন্‌কী ত' বিহারেই রহিয়া গেল। খণ্ডিত বাংলার ভারতীয় অংশটুকু পুপুন্‌কীকে নিজের ঘরের জিনিষ করিয়া লইতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গ হইতে পুপুন্‌কী আশ্রম কোনও তোষণ, পোষণ বা লালন-পালন পায় নাই। আর মানভুম জেলা ত' অমনিই বিরূপ হইয়া রহিয়াছে। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পরে বত্রিশ বৎসর পার হইয়া গেল, তবু স্থানীয় জনগণের একাংশকেও নিষ্ঠাপূর্ব্বক আশ্রমে শ্রমদান করিতে দেখা যায় নাই। আশ্রমের ত্যাগী কর্ম্মীরা জান কবুল করিয়া শ্রম

করিতেছে আর স্থানীয় মজুরেরা নিজেদের দুর্ভিক্ষ-সঙ্কটে আসিয়া মাটি কাটিয়া, ইট তৈরী করিয়া, দেওয়াল গাঁথিয়া আশ্রমের শ্রমলব্ধ অর্থ মজুরী স্বরূপে ঘরে নিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছে। শ্রমদানের পবিত্র মনোভাব এদেশে এখনো জাগরিত হয় নাই।

এমত অবস্থায় তোমাদের মত শ-দু'শ টাকা মাহিনার চাকুরে বাবুরা দূর হইতে পাঁচ দশ টাকা করিয়া পাথেয় খরচ বহন করিয়াও আশ্রমে আসিয়া যদি কুলীর মত অকুণ্ঠিত চিত্তে বৎসরের কতকটা সময় খাটিয়া যাও, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা চমৎকার ব্যাপার হইবে। আর্থিক দিক দিয়া ইহাতে আশ্রম খুব যে লাভবান্ হইবেন, তাহা নহে, আর তোমাদের ত' সবদিক দিয়াই কেবল আর্থিক ক্ষতি। তবু তোমরা এইবার আসিয়া একটা রেখাপাত করিয়াছ। আগামীতে আরও অধিক সংখ্যায় আসিয়া কাজ করিয়া গেলে সেই রেখা আরও একটু সুস্পষ্ট হইতে পারে। আগামী বৎসরের কার্য্যের দ্বারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইবে, তাহার আলোকে তৃতীয় বৎসরের কর্ম্মপন্থা নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

আমার এই পত্র পাঠ করিবার পরে তোমাদের মধ্যে অনেকেরই খুব আগ্রহ হইবে যেন তাহারা আগামী বর্ষায় ধান্য রোপণের কাছাকাছি সময়ে একযোগে পুপুন্‌কী আশ্রমে শ্রমদান করিবার জন্য যাইতে পারে। কিন্তু ইহাকে একটা হুজুগের ব্যাপারে পরিণত করিলে কিন্তু মস্ত বড় ভুল হইয়া যাইবে। ইহা শুধুই শ্রমদান নহে, ইহা প্রেমদান। আমি ত' তোমাদের নিকটে অর্থ কখনও চাহি নাই কিন্তু প্রেম চাহি নাই বা চাহিব না, এমন কথা বলিব কেমনে? আমি

নিজে যেমন তোমাদের সকলকে প্রেমদান করিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতে চাহি, তেমন আবার তোমরা জগতের কল্যাণকর্ম্মে হৃদয় উজাড় করিয়া প্রেমদান করিতেছ, তাহাও দেখিতে চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩রা ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ করিয়া থাক, ইহা বড়ই সুখের কথা। প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করিলে নিজের সাধনে উদ্দীপনা বাড়ে এবং সকল প্রকার আবিলতার ঊর্দ্ধে অবস্থান করিবার জন্য প্রাণে প্রেরণা জাগে।

কিন্তু সাধুসঙ্গ করিবার মধ্যেও সঙ্গত ও অসঙ্গত দুইটা ঢং আছে। তোমার সাধুসঙ্গ করিবার ঢং, আমার মনে হয়, বিপজ্জনক। একজন সাধুর সঙ্গ করিবার ফলে তুমি এই ধারণাই আহরণ করিলে যে, তোমার নিজের সাধন-মার্গ বড়ই শুষ্ক ও নীরস। ইহার ফলে এতদিন যে সাধনে তোমার মনে কতই না দিব্য আনন্দের স্ফূর্ত্তি হইতেছিল, তাহা এখন কল্পনা করিয়া আনন্দহীন ও রসহীন বলিয়া ভাবিতেছ। এতদিন যে সাধন তোমাকে প্রতি বিপদে অভয় এবং প্রতি পরীক্ষায় দুর্জ্জয় সাহস দিয়া আসিতেছিল, এখন তুমি তাহাকেই ব্যর্থ, বিফল ও নিষ্করুণ বলিয়া মনে মনে ব্যাখ্যা করিতেছ। নিজের

ভিতরে নিজে শত কল্পিত অভিযোগ, অনুযোগ সৃষ্টি করিতেছ এবং তাহার জ্বালায় নিজেকে অধীর, অস্থির, চঞ্চল করিয়া তুলিয়া এই চঞ্চলতাকেই তোমার পথপরিবর্ত্তন ও মতপরিবর্ত্তনের উপযুক্ত যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছ। তোমার অন্তরের এই বিপুল ঝঞ্ঝা দর্শনে আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি এবং আশীর্ব্বাদ করিতেছি, নিত্যমঙ্গলময় তোমার চিত্তকে প্রশান্ত করুন।

লগ্ন হও ঈশ্বরে। আমাকে বা অন্য কাহাকেও ভাবিবার প্রয়োজন নাই। প্রেম দাও ঈশ্বরে। নিজেকে বিকাইয়া দাও ঈশ্বরের পায়ে। নিজেকে সমর্পণ কর, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে। এই জায়গায় স্থির থাকিয়া বাহিরের অন্য কর্ত্তব্যকে গৌণ জ্ঞান কর। অবশ্য জাগতিক কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিলে চলিবে না, সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইতে হইবে। সেই সামঞ্জস্য আসে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে ঈশ্বরকে দেখিবার চেষ্টা হইতে, তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবাকে তাঁহারই সেবা বলিয়া জানা হইতে। তুমি ত' বাবা সুপণ্ডিত, তোমাকে বুঝাইয়া লিখার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ঈশ্বর-প্রেম যদি তাঁহার সৃষ্ট জীবে প্রেম না দিল, তবে বুঝিতে হইবে, কোথাও একটা ফাঁকি রহিয়া গিয়াছে। জীবে প্রেম যদি ঈশ্বরে না প্রেমসঞ্চার করিল, তবে বুঝিতে হইবে এই প্রেমও খুব খাঁটি জিনিষ নহে।

কেবলই ভাবোচ্ছ্বাসে চলিও না। একটু হিসাবও করিয়া দেখিও। যাঁহারা নিজেদিগকে হিসাবের পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহাদেরও অনেককে অত্যন্ত বেহিসাবি ও অবৈজ্ঞানিক বিচার করিতে দেখা যায়। নিজের অহমিকাকে মানুষ নিজে দেখিতে পায় না, তাই অনেক সময়ে অহমিকা-প্রলুব্ধ মিথ্যা যুক্তিজালকে

বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক সত্য বলিয়া দর্পভরে ধারণা করে। নিজের ধ্যানের সহিত সকল ধারণাকেও প্রেমময় পরমেশ্বরের হাতে সঁপিয়া দাও। ইহাতেই সর্ব্বাধিক কুশল হইবে। সকল সমস্যার সমাধান আসিবে এই পথে।

রাস্তায় নামিয়া যে অগ্রসর হয় না, পথিক দেখিলেই কেবল জিজ্ঞাসা করে, এটা হাওড়া যাইবারই পথ কিনা, তাকে ট্রেইণ মিস্ করিতে হয়। যে রাস্তা ধরিয়াছ, আমৃত্যু নিষ্ঠায় তাহাতে লাগিয়া থাকার জিদ কর। বৃথা গেলে বড় জোর একটা জন্মই যাইবে। বারংবার মত ও পথের বদল করিতে করিতে কয়টা জন্ম বিফল হয়, তাহা কে বলিতে পারে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩রা ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অল্প সময়ে বেশী কাজ করিতে হইলে ঐক্য এবং সম্প্রীতির মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব। প্রেমের মধ্য দিয়া যে ঐক্য আসে, তাহা স্থায়ী হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত সাফল্য অর্জ্জন কর। কিন্তু খাতার পরীক্ষাই পরীক্ষা নহে, জীবনের পরীক্ষাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় পাশ করিতে হইলে প্রেমের পাঠ পড়িতে হয়। প্রেম মানে আত্মপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, জীবপ্রেম এবং ভগবৎ-প্রেম। সব প্রেম সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যাহার জীবনে প্রকাশ পায়, সে-ই পূর্ণ মানুষ। ইহার মধ্যে আত্মপ্রেম অতি নিম্ন পর্য্যায়ের বস্তু। কারণ, নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে গেলে ইহা বিশ্বপ্রেম এবং ভগবৎ-প্রেমের পরিপন্থী হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। তোমার পরিশ্রমের তুলনায় ফল খারাপ হইলেও ইহা তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির দুয়ার উন্মুক্ত করিল। যদি সম্ভব হয়, আরও পড়িও।

জীবনের সম্ভাবনা সমূহকে কখনও ছোট করিয়া দেখিও না। জীবনের মহিমাকে নিজের মনের কাছে খাটো হইতে দিও না। এই জীবন দিয়া ভগবানের কাজ করিতে হইবে, জগতের কোটি কোটি দুঃখার্ত্তের দুঃখ-বিদূরণের দুশ্চর তপস্যা করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ

কাটিহার (পূর্ণিয়া)

৭ই ভাদ্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

রোগ মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। রুগ্ন শরীরে ভগবানের কাজ করা কঠিন হয়। রুগ্ন দেহে মনও রুগ্ন হইতে চাহে। রুগ্ন ব্যক্তির আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস কমিয়া যায়। এই কারণেই রোগ হইলে তাহাকে অবহেলা করিতে নাই। এই কারণেই রোগ নিরাময়ের চেষ্টাকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াই গণ্য করা উচিত।

কিন্তু শারীরিক অনিয়ম বা নৈতিক অপরাধ করিবার ফলে যেন আমার রোগ হইল। চিকিৎসা করিয়া সারিয়া গেলাম। পুনরায় আমি যদি সেই সকল অনিয়ম বা অপরাধ করিতে থাকি, তবে আমাকে ক্ষমা করিবে কে? রোগ একবার হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হওয়া দরকার যেন রোগ সারিবার পরে আর না আসে। যেখানে এই সাবধানতা নাই, সেখানে রোগচিকিৎসাও প্রশংসার্হ নহে।

চিকিৎসক যেইরূপ নির্দ্দেশ দিবেন, পথ্যাদি তদ্রূপই করিবে, ইহা নিয়া সঙ্কোচ করা নিরর্থক। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতরের রুচিটাও লক্ষ্য করিও। কাহার প্রোটিন দরকার, কাহার দরকার কার্বোহাইড্রেট, চিকিৎসকেরা তাহার নির্ণয় করিয়া থাকেন রোগীর রোগলক্ষণ দেখিয়া কিন্তু রোগী নিজের ভিতরে তাকাইয়া অনায়াসে তাহা অপেক্ষা নির্ভুলতর নির্ণয় করিতে পারে। তোমার যদি দধি-সেবনের প্রবল আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই এই কথা মোটামুটি ধরিয়া লইতে পার যে, দধির যাহা প্রধান উপাদান, তাহা তোমার শরীরে প্রয়োজন। লোভকে শাসনে রাখিয়া কেহ যদি ভিতরের রুচিকে খুঁজিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে মল-মূত্র-রক্তাদির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ব্যতীতও সে স্থির করিয়া নিতে পারে যে, তাহার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ কোন্ বস্তু পথ্য এবং কোন্ কোন্ বস্তু অপথ্য।

নিজেকে সর্ব্বতোভাবে পরমপ্রেমময় পরমেশ্বরের হাতে সঁপিয়া দাও। তুমি যে তোমার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মানব-তনু ধারণ কর নাই, পরন্তু করিয়াছ ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণের জন্য, এই কথাটি দিবারাত্রি নিবিড় ধ্যানে জাগাইয়া রাখ। এই একটী অনুশীলনের মধ্য দিয়াই তোমার জীবনের যাবতীয় ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হইয়া যাইবে। এই একটী অনুশীলনের মধ্য দিয়া জীবনে আসিবে ঈশ্বর-নির্ভর আর সুগভীর প্রেম। জীবন তখনই সার্থক হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ

কাটিহার (পূর্ণিয়া)
৭ই ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। বৈষয়িক ব্যাপারে দৈবশক্তির সাহায্য লাভে চেষ্টা কোনও কাজের কথা নহে। নিজে ধর্ম্মপথে থাকিয়া সদ্‌ভাবে চলিবার চেষ্টা করিবে এবং বিবেককে অকলঙ্ক রাখিয়া বৈষয়িক কর্ত্তব্য পালন করিতে যত্নবান্ হইবে। "হে ভগবান্, আমাকে মামলায় জিতাইয়া দাও, লটারির টিকেট পাওয়াইয়া দাও, ইন্দ্রজাল-বিদ্যা শিখাইয়া দাও যেন ভোজবাজীর বলে হাইকোর্টের জজের রায় বদল করিয়া দিতে পারি",—এই ভাবে যদি তোমরা ভগবানের নিকটে আর্জ্জি পেশ করিতে থাক, তাহা হইলে ভগবান বেচারীর প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে সুতরাং বৈষয়িক ব্যাপারে ভগবানকে বিরক্ত করিতে বিরত হইও। সর্বপ্রকার বৈষয়িক কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের যোগ্য শক্তি ও প্রতিভা দিয়াই ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে যেন সমর্থ হও, তাহার অপব্যবহার যেন তোমার দ্বারা না হয়। ভগবানের কাছে মাত্র এইটুকুই প্রার্থনা তুমি করিতে পার। ভগবানকে সর্ব্বমঙ্গলনিলয় জানিয়া যাহারা তাঁহার প্রদত্ত শক্তিকে সর্ব্বদা সদ্‌ভাবে সদুদ্দেশ্যে নিয়োগের জন্য চেষ্টা করে, ভগবান তাহাদের শক্তি নিজে হইতেই বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

ভগবানে অসীম ভক্তি-প্রীতি-আস্থা রাখিয়া জীবনের পথ চল। দেখিও, পদক্ষেপে কখনও ভ্রম হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ

কাটিহার (পূর্ণিয়া)
৭ই ভাদ্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লক্ষ্য রাখিয়া চলিও যেন, এক কথা দশবার বলিতে না হয়, এক কাজ বৃথা বৃথা দশবার করিয়া করিতে না হয়। মানুষের পরমায়ু অনন্ত নহে। অল্প সময়ে তাহাকে অনেক কাজ করিতে হইবে। এই জন্যই কৃপণের ন্যায় কম কথা বলিয়া, কম আয়ুঃক্ষয় করিয়া বেশী কাজ করিতে হইবে।

আরও লক্ষ্য রাখিও, সকল উদ্যমের কর্ত্তা যে ভগবান, তুমি তাঁহার হস্তধৃত যন্ত্রমাত্র, এই কথাটি নিমেষের জন্য ভুল না হয়। উপলব্ধিতে যাহা সত্য হইয়া ফোটে নাই, নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা তাহাকেও ক্রমশঃ উপলব্ধি-লব্ধ সত্যে পরিণত করা যায়।

ঈশ্বরীয় প্রেমে নিয়ত ডগমগ থাকিয়া কাজ করিয়া যাইবে। প্রেমচ্যুত হইলে ত' কেন্দ্রচ্যুত হইয়া গেলে, ইহা মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)
৮ই ভাদ্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাটিহারের দুই দিনের ভাষণ ভালই হইল। পরশু রোলারাম ইন্স্টিটিউটের ভিতরে সভা বসিয়াছিল। শুনিলাম, স্থানাভাবে তিন চারি হাজার শ্রোতা ফিরিয়া গিয়াছেন। কাল তাই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া মাঠ ভিজিয়া যাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় উদ্যোক্তারা ইন্ষ্টিটিউটের বাহিরের মাঠে সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ধৈর্য্যশীল জনতা দুই দিন ধরিয়াই প্রাচীন ভারতের তপস্যার মহিমা উৎকর্ণ শ্রবণে শুনিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল, নাস্তিক্যভাবপীড়িত ভারতবর্ষে আবার ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রবল প্লাবন আসিয়াছে।

মনে করি নাই, আজ সকালেই শিলিগুড়ি পৌছিতে পারিব। অতিরিক্ত প্লাবনে কত জায়গার রেল লাইন যে বিপন্ন হইয়াছে, বলিবার নহে। কাটিহার হইতে ট্রেণ ছাড়িবে-না ছাড়িবে-না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছাড়িল এবং শিলিগুড়ি পৌছিতে তিন ঘণ্টার মত দেরী হইল। তোমাদের গুরুভ্রাতা সুধাংশু ছিল ড্রাইভার। শুনিলাম সমস্ত সীমান্ত রেলপথে সে শ্রেষ্ঠ ড্রাইভার।

জীবনটাও ঠিক তেমনি। চলিতে পারিব-না পারিব-না করিয়া চলা সুরু করিতে হয় এবং শ্রেষ্ঠ চালক ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিলে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে আসিয়া পৌছিতে হয়। তোমরা দ্রুত বা

দেরীর বিচার করিয়া ক্লান্ত হইও না। যেদিনই হউক, লক্ষ্যে নিশ্চিতই পৌঁছিবে। কেবল ঈশ্বরে নির্ভর রাখিয়া চল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ সাঁতালি (জলপাইগুড়ি)

৯ই ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকাল সাড়ে ছয়টায় শিলিগুড়ি ছাড়িয়াছি। বন্যার জন্য কত স্থানে রেলের পোল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই ট্রেণ আজ ছাড়িবে কিনা সন্দেহ ছিল। শেষ পর্য্যন্ত ট্রেণ শিলিগুড়ি হইতে ছাড়িল এবং মাদারীহাট আসিয়া চারি ঘণ্টা বসিয়া রহিল। বিকাল চারিটায় হ্যামিলটনগঞ্জ পৌঁছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি ও সাধনা হস্তিপৃষ্ঠে ও ব্রহ্মচারীরা পদব্রজে সাঁতালি রওনা হইলাম। পথে বন্যার চিহ্ন সুস্পষ্ট, দুই এক স্থানে খরস্রোতা জলধারা অতিক্রম করিতে হইল। সাঁতালি একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। মেচ জাতির বাসস্থান। স্থানীয় মেচ বংশীয় জোতদারদের স্কুলে আমাদের সভার ও থাকিবার স্থান হইয়াছে। ভাষণান্তে রাত্র দশটায় করিলাম সমগ্র দিনের আহার। অনিয়মটা চূড়ান্তই হইয়াছে, কাজও এখানে বিশেষ কিছুই হয় নাই। ভাষণ দুই জনে পূরা তিন ঘণ্টা দিয়াছি। কিন্তু লোকসমাগম বলিতে গেলে কিছুই ছিল না। কৃষির সময়, লোকজন কম হওয়া গ্রামদেশে খুবই

স্বাভাবিক। কিন্তু আরও নানাবিধ অসুবিধা হইয়াছে। অনুসন্ধানে শোনা গেল, আমরা আসিবার আগেই এখানে কোনও ধর্ম্মপ্রচারক-সংঘ নাকি গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন যে, আমার পিছনে পিছনে যে হাজার হাজার লোক ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, আমি সকল বড়লোকদের সম্পত্তি কাড়িয়া নিয়া গরীবদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেছি। ফলে অনেকেই ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ভীতি তাঁহাদিগকে আগন্তুক কর্ত্তব্য সম্পর্কে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল।

তবু এখানে পরমপ্রেমসহকারে কাজ করিয়াছি। যাঁহারা মনে করেন যে, একমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্মমতই সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়া দিয়া অন্যান্য সকল ধর্ম্মমতকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ হইবে, তাঁহাদের অজ্ঞানতার প্রতি বিরক্ত না হইয়া প্রেমভরে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছি। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়াছি আমার সন্তানেরা যেন কখনও ধর্ম্মান্ধ মূঢ়তায় এইভাবে কোনও ধর্ম্মসঙ্ঘের সত্যপ্রচার কার্য্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিতে না রুচিসম্পন্ন হয়। মহারণ্যে কেবল শালগাছ থাকিবে, বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, সেগুন, ভূর্জ্জ, চন্দন, তাল, তমাল, পিয়াল থাকিবে না, এই কল্পনা ত' প্রেমহীন মূর্খদের জন্য। অজ্ঞানতা এবং প্রেমহীনতা উভয়েই জীবনের এক একটা নিদারুণ অসম্পূর্ণতা। মানুষ হইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যেন সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হয়।

এতকাল তোমরা অভিযোগ করিয়াছ যে, খ্রীষ্টান এবং

মুসলমানেরা ধর্ম্মপ্রচারের উন্মত্ততায় হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি করিয়া নিজেদের দল-পরিপুষ্টি করিতেছেন। এখন দেখা যাইতেছে, এক হিন্দুসমাজের দুই তিন চারি অংশে বিভক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায়ের বৈধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টাতে বাধা দিয়া যাইতেছেন। করিমগঞ্জের জনসাধারণ একমাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা দিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন, রাস্তার উপরের একটা তোরণের উপর হইতে হঠাৎ বিরাট এক পাথর পড়িল। সময়মত পড়িলে তাহা আমার মস্তক চূর্ণ করিতে পারিত। আর একস্থানে প্রণাম করিবার নাম করিয়া ভিড়ের মধ্যে একজন আমার পায়ে এক বিষাক্ত সূচ বিদ্ধ করিয়া দিল। এইরূপ ব্যাপারও নিয়তই ঘটিতেছে। কাহারা ইহা করিতেছেন? যাঁহারা ধর্ম্মান্ধতা বশতঃ মনে করেন যে, একমাত্র তাঁহাদের গুরুদেবই জগতের সকলের পূজ্য অবতার হইয়া বিরাজ করিবেন, তাঁহাদেরই প্রেরিত লোকেরা এই সকল অকার্য্য করিতেছে। আমি ৭ই ভাদ্র কাটিহার হইতে ট্রেণে রওনা হইয়াছি শিলিগুড়ি আর সেই কাটিহার হইতেই টেলিফোণ যোগে বা অন্য প্রকারে মালজংশন, দোমোহনী প্রভৃতি স্থানে খবর আসিয়া গেল যে, বন্যা দেখিয়া আমি কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছি। এই সংবাদ আবার তাঁহারই নামে প্রচারিত হইল, যিনি নিজে প্রাণপণ খাটিয়া কাটিহারের অনুষ্ঠানের সাফল্য বিধান করিয়াছেন, যিনি নিজে আসিয়া আমাদিগকে কাটিহারে ট্রেণে তুলিয়া দিয়াছেন। মালজংশনে আসিয়া দেখি, একটী লোকও ষ্টেশনে নাই, অথচ অনেক লোকের থাকিবার কথা ছিল। কিছুকাল আগে লামডিং ও মণিপুর রোডে হঠাৎ আমার মৃত্যু-সংবাদ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল।

এই সকল মিথ্যা প্রচারের দ্বারা আমাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার একটা পদ্ধতিবদ্ধ চেষ্টা বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়াই চলিতেছে। আদর্শ প্রচারের দ্বারা নহে, অবতারবাদ প্রচারের দ্বারাই সঙ্ঘপরিপুষ্টি যাহাদের পন্থা, তাহাদের পক্ষে এইরূপ দুর্নীতি অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত বা উদ্বেজিত না হইয়া তোমরা ইহাদিগকেও তোমাদের ভ্রাতাভগ্নী জ্ঞান করিয়া অন্তরের সুগভীর প্রেম অর্পণ কর। নিজের ভাই যদি অন্ধ হয়, মূর্খ হয়, তাহা হইলে তাহাকে করুণা না করিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করাও এক নিদারুণ মূর্খতা। তোমরা লোকের মূর্খতা দেখিয়া নিজেরা ক্রোধান্ধ হইয়া মহামূর্খের আচরণ করিও না।

এই প্রেমের বাণীই আমি সাঁতালিতে ছড়াইয়া গেলাম। সত্য অবিনশ্বর। মিথ্যা এবং অপপ্রচার যেখানে কর্ম্মে দিয়াছে বাধা, সেখানেও সত্য তাহার অমোঘ বিক্রম যথাকালে প্রকাশিত করিবে। তোমরাও সত্য ও প্রেমে হও অকপট বিশ্বাসী। চালাকী ও চালবাজি দ্বারা জগতে কোনও মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। নিজেরাও চালাকীতে বিশ্বাস করিও না, অপরের চালাকীকেও বৃথা মূল্য দিও না। সত্যের প্লাবনে মিথ্যা ভাসিয়া যাইবে। পরমেশ্বরে অকপট ভক্তিই জগতে নিত্যজয়যুক্ত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪৭)

হরি-ওঁ

হ্যামিলটনগঞ্জ (জলপাইগুড়ি)
১০ই ভাদ্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হ্যামিলটনগঞ্জকে নিতান্তই সাধারণ একটা স্থান মনে করিয়াছিলাম কিন্তু এখানকার জনসমাবেশের বিশালত্ব, ক্ষুদ্র-বৃহৎ-নির্ব্বিশেষে সকলের একপ্রাণ উৎসাহ এবং সুগভীর উদ্দীপনা দর্শনে আমাদের সেই ভ্রম ভাঙ্গিল। কোনও স্থানকেই ছোট বলিয়া ভাবিতে নাই, কোনও মানুষকেই ছোট মনে করিতে নাই।

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ভাষণ সুরু হইয়াছিল। এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। আমি আমার ভাষণ দিয়া অনেকক্ষণ আগেই বিশ্রামস্থানে চলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সাধনার ভাষণ চলিতেছে। একটু বৃষ্টিও হইয়া গেল, তবু মানুষগুলি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতবৎ সভাস্থলে বসিয়া আছেন। এ দৃশ্য না দেখিলে বুঝিবে না। প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা হইতেছে। মানুষকে আমরা কত অমনোযোগী এবং বহির্ম্মুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু মনোযোগী ও অন্তর্ম্মুখ হইবার ক্ষমতাও তাঁহাদের অসাধারণ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এস আমরা পণ করি যে, যাহাদিগকে বহির্ম্মুখ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাদের প্রতিজনকে আমরা অন্তর্ম্মুখ করিব। একজনকেও বহির্ম্মুখ হইয়া চলিতে দিব না। প্রেম-সহকারে যদি কাজ করি, কেন আমরা সফল হইব না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ

কামাখ্যাগুড়ি (জলপাইগুড়ি)
১১ই ভাদ্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মসংঘবিশেষের কর্ম্মী ও শিষ্যরা অপপ্রচার করিতেছে আর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগ অন্য দিকে বিরাট শোভাযাত্রার রূপ ধারণ করিয়া ষ্টেশানে অভ্যর্থনা দিতেছে। এই এক বিচিত্র বৈপরীত্বের মধ্য দিয়া চলিয়াছে আমাদের ভ্রমণ। সন্ধ্যায় ভাষণ দিয়া আসিলাম। পাঁচ ছয় হাজার জনতা রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত মাঠের ভিজা মাটিতে বসিয়া ভাষণ শুনিয়া গেলেন। এই ধৈর্য্য তাঁহাদের দিল কে? বন্যায় সারাটা দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। মাঠ, ঘাট সব ডুবিয়া কয়েকটা দিন সর্ব্বপ্রকার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিছিন্ন হইয়া রহিয়াছিল। অনেককে আজ এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া সভাস্থলে আসিতে হইয়াছে।

ভারতের অতীত ভারতের ভবিষ্যৎকে ডাকিতেছে। জনতার এই একান্ত আগ্রহ তাহারই পরিচয়।

তোমরা ভারতের অতীতকে বিশ্বাস করিও, ভারতের ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করিও। প্রেমসহকারে বিশ্বাস করিও যে, অতীতের বীর্য্যে ভবিষ্যতের গর্ভে ভারতের নবজন্মান্তর নিখিল বিশ্বেরই কুশলের জন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৯)

বাণেশ্বর (কুচবিহার)
১৩ই ভাদ্র, ১৩৬৫

হরি-ওঁ

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বাণেশ্বর আমাদিগকে প্রেমভরে গ্রহণ করিয়াছেন। অসুর বাণ রাজা এখানে শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাহিনীটা অনেকটা বৈদ্যনাথধামের অনুরূপ। সেখানে রাবণ রাজা যে কারণে স্কন্ধ হইতে মহাদেবের বিগ্রহ নামাইয়া রাখিয়া পরে পস্তাইয়াছিলেন, বাণ রাজা এখানেও তদ্রূপ কারণে মহাদেবকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়াছিলেন। ব্যাস! মহাদেব বসিয়া পড়িলেন আর উঠিলেন না। এখানেই মহাদেবের মন্দির হইল। অনার্য্য প্রথায় এখনো এখানে মহাদেবের আসুরিক পূজা ও বলি প্রভৃতি হইয়া থাকে। বলি অর্থাৎ ফাঁসী দিয়া খাসী-বধ।

মহাদেব অনার্য্যদের দেবতা। রাবণ ও বাণ রাজার মত শক্তিমান্ অনার্য্য রাজারা এই দেবতার পূজক। আর্য্যগণ এই দেবতাকে সহজে স্বীকার করেন নাই। দক্ষযজ্ঞের পরে আসিল স্বীকৃতি। সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি নিয়া মহাদেব এই বাণেশ্বরের মন্দির-তলে বসিয়া আছেন। তাঁহার সেবকেরা আমাদের যুক্তকরে মুক্তপ্রাণে গ্রহণ করিলেন। আমরাও ত' সাম্যের প্রচারক।

কিন্তু এখানে সঙ্ঘবিশেষের প্রচারকেরা প্রায় ঘরে ঘরে গিয়া এক অপূর্ব্ব সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। ওঙ্কারমন্ত্র জপ করিলে

নাকি কুষ্টরোগ জন্মে, নির্ধনতা হয়, বংশনাশ হয়। গ্রাম্য লোক এই সকল কথা শুনিয়া ভয়ে তটস্থ হইয়াছে কিন্তু তবু কাল সন্ধ্যার সময়ে বাণেশ্বর-মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে হাজার হাজার যুবক-বৃদ্ধ ও পুরুষ-নারী সাড়ে চারি ঘণ্টা ধরিয়া ভাষণ শুনিয়াছেন।

মিথ্যা ত' অন্ধকারেই রাজত্ব করে। জ্ঞানের আলো ফুটিয়া উঠিলে মিথ্যা প্রাণভয়ে দূরে করে পলায়ন।

এই সকল মিথ্যা-প্রচারকারীদের প্রতি একদল জনসাধারণ খুবই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন, ইহাও লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু আমাদের যেন ইহাদের প্রতি অন্তরের কোনও আক্রোশ না থাকে। আমরা যেন ক্ষমাভরে স্নেহ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ইহাদের প্রতি তাকাইতে পারি।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মগুরু এই কথা প্রচার করিয়াছেন যে, ওঙ্কার-সাধনা করিলে কাম-রিপুর নিদারুণ প্রবলতা জন্মে। তিনি পণ্ডিত লোক, সংস্কৃত সৎশাস্ত্র ও অপশাস্ত্র হইতে হাজার শ্লোক উদ্ধার করিয়া নিজের বক্তব্য বিষয় প্রচার করিবার যোগ্যতা যথেষ্টই রাখেন। অনেক তথাকথিত শিক্ষিত লোক এই সকল অনুষ্টুপ শুনিয়া শুনিয়া ধারণা করিয়া ফেলিতেছেন যে, ওঙ্কার-জপ করিলেই তাঁহাদের আসঙ্গ-লিপ্সা ও স্ত্রীসহবাস-লোলুপতা দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইবে এবং ইহার ফলে ইঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ অত্যন্ত অর্ব্বাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকে ঋগ্বেদ বা ছান্দোগ্য উপনিষদের ন্যায় সুপ্রাচীন বলিয়া প্রচার করিয়া আরও নূতন নূতন লোকের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটাইতেছেন। ব্যাপার অতি চমৎকার! একজন

মাতালকে কেহ বলিয়াছিল,—ওরে, মদ খাস্‌নে, মদ খেলে নরকে যাবি। প্রশ্ন হইল—মাইকেল মধুসূদনের কি নরক হইয়াছে? উত্তর হইল,—হাঁ! পুনরায় প্রশ্ন হইল,—সেক্‌স্‌পীয়রের কি নরক হইয়াছে? উত্তর হইল,—হাঁ। মাতাল বলিল,—তবে ত' নরক গুলজার! এমন সব কবি ও পণ্ডিত লোকের সঙ্গে থাকিতে পারিলে আর নরকে ভয় কি? ঠিক সেই রকম অবস্থাটা হইয়াছে। বড় বড় বিদ্যাদিগ্‌গজ পুরুষেরা নিজ নিজ ধর্ম্মীয় সঙ্কীর্ণতার প্রেরণায় মিছামিছি অসত্য সৃষ্টি করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, ওঙ্কার জপ করিলে কামলোলুপতা বাড়ে, তবে আর চুণাপুটিদের সে কথা বলিতে ভয় কি?

কেহ বলিবে, ওঙ্কার জপ করিলে কুষ্ঠব্যাধি হয়, কেহ বলিবে ওঙ্কার জপ করিলে কামোত্তেজনা বাড়ে এবং মৃদঙ্গ-করতাল ও ভাব-সমাধির অসামান্য কৌলীন্যে এমন মিথ্যা কথাও বেদবাক্যের মত হাজার হাজার লোকের নিকটে আদৃত হইবে। তবু কিন্তু তোমরা মনে করিও না যে ইহাদের প্রতি বিরুদ্ধ প্রচারের তোমাদের প্রয়োজন আছে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যাঁহারা ধর্ম্মের যাজনা করিবেন, তাঁহারা দিনে পঁচিশ বার করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেও এই সকল ভ্রম হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে পারিবেন না। তোমরা এই সব মহৎ ব্যক্তির এই সকল ভ্রান্ত উক্তির উপরে এক কাণাকড়ি মূল্যও আরোপ করিও না।

তোমরা তোমাদের সাধন করিয়া যাও। নিশ্চয় তোমরা এই একটী জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছ যে, বিগত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রচারক-জীবনে আমি কখনও পরমত-খণ্ডনের জন্য, অপরের পথকে হেয়

বলিয়া বর্ণনা করিবার জন্য, অন্যের গৃহীত সাধনকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য এক কণা পরিশ্রমও করি নাই। অপিচ, আমার নিজের সাধনকে প্রচার করিবার জন্যও বিশেষ কিছু কদাচিৎই বলিয়াছি। আমি ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষের মতকে প্রচার করা অপেক্ষা উন্নত আদর্শবাদকে প্রচার করা অধিকতর কামনীয় মনে করিয়াছি। তাহাই আমি আমৃত্যু করিয়াও যাইব।

তোমরাও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিও। সর্ব্বমতের সর্ব্বপথের মানব-মানবীর বুকে সাহস দেওয়া ও বাহুতে বল-সঞ্চার করাই আমাদের লক্ষ্য হইবে। সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের লোককে কাড়িয়া আনিয়া নিজেদের গণ্ডীভুক্ত করিবার প্রয়াসের ভিতরে লাভ যতই থাকুক, মর্য্যাদা নাই, পৌরুষ নাই।

তোমরা প্রেমভরে সকল সম্প্রদায়ের সাধন-পথাবলম্বী ব্রতীদের দিকে তাকাইবে,—ঈর্ষ্যা বা জিগীষার দৃষ্টিতে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ

কুচবিহার

১৪ই ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কুচবিহার সহরটা বড়ই ভাল লাগিল। প্রাণভরা প্রেম আর

আতিথেয়তা লইয়া যেন সমগ্র সহর আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। বৃষ্টি চলিতেছিল, তার মধ্যে বসিয়া হাজার হাজার সজ্জন ও মহিলা ভাষণ শুনিতে লাগিলেন। বৃষ্টি অধিক হওয়ায় শেষে হলে ঢুকিতে হইল। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। সাধনার ভাষণ চলিতেছে।

সারা শরীর যাহাদের বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে, এমন পুরুষ-নারীরাও হলের ভিতরে, কেহ কেহ বাহিরে, দাঁড়াইয়া ভাষণ শুনিতেছেন। কিসের ভাষণ? না, ভারত অতীতে মহৎ ছিল তাহার সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবাদের বলে, ভারত ভবিষ্যতে আরও মহৎ হইবে সর্ব্বজীবে প্রেম ও ব্রহ্মসাধনের অধিকার বিলাইয়া।

ভারতকে আজ তাহার পন্থা দেখাইতে হইবে। সেই পন্থা আত্ম-কলহবর্জ্জিত সর্ব্বজনের সুখ-লাভের পন্থা। সেই পন্থা প্রেম, প্রীতি সহিষ্ণুতার পন্থা। সেই পন্থা জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি জীব ও প্রতি পরমাণুর সুখসম্পাদনের প্রয়াসের পন্থা।

এস আমরা তাহাতেই নিজেদের নিয়োজিত করি। বিভিন্ন ধর্ম্মসংঘ বা কর্ম্মিসঙ্ঘ যখন পরস্পরের প্রতি হানাহানি করিয়া শক্তির বৃথা অপচয় করিতেছেন, এস আমরা সেই সময়ে সকলের প্রতি সমবুদ্ধি ও প্রেমভাবের অনুশীলন করিয়া নিজেদের যাবতীয় দৌর্ব্বল্য বিনষ্ট করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ

কুচবিহার

১৪ই ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা সকলে দলবল সহ কুচবিহারে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলে না বলিয়া দুঃখিত হইয়াছ। কিন্তু প্রত্যহই যে তোমরা একটু ইচ্ছা করিলেই দিনে চারিবার করিয়া উপাসনা করিবার সময়ে আমাকে দেখিতে পার, তাহা ভুলিয়া যাইতেছ কেন?

আর, দেশে বিদেশে হাজার হাজার নিরন্ন, দরিদ্র, আর্ত্ত, অনাথ, নিরাশ্রয়, আতুরের মধ্যেও ইচ্ছা করিলেই আমাকে দেখিতে পার।

প্রয়োজন শুধু তোমার ইচ্ছাটুকুর। সামর্থ্যের তোমার অভাব আছে বলিয়া কখনও ভ্রমেও ভাবিও না। ইচ্ছা করা মাত্র সে সামর্থ্য তোমার আসিবে।

আমাতে প্রেম থাকিলে আমাকে তোমরা সকল বস্তুতেই দর্শন করিতে পারিবে। আমাকে সশরীরে দর্শন করা যতটুকু পুণ্যজনক, আমাকে সর্ব্বজীবের মধ্যে দর্শন করা তার চেয়ে কম পুণ্যকর নহে।

প্রাণভরা প্রীতি সহকারে এই কথাটুকু চিন্তা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি)
১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের সহরটা ঘুরিয়া আসিলাম। অথবা সত্য করিয়া বলিতে গেলে তোমাদের সহরটা চষিয়া আসিলাম। ইহার পরেও তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতেছ যে, তোমাদের শ্রম বৃথা হইয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে সহিষ্ণুতার অভাব। আজ যে কাজ করিবে, তার ফল অনেক সময়ে তিন বৎসর পরে, কখনও কখনও ত্রিশ বৎসর পরে, এমন কি তিন শত বৎসরের পরে পাওয়া যায়। ডাঁটা গাছে ফল পঁয়তাল্লিশ দিনে ফলে, বটগাছের ফল ফলিতে দশ বিশ বৎসর প্রয়োজন হয়। ফলের জন্য অত ব্যস্ত হইবে কেন?

কাজ তোমরা খুব খাটিয়াই করিয়াছ। কিন্তু তাহা সফল-কর্ম্ম কিনা, তাহার বিচার হইবে কি দিয়া জানো? এই কর্ম্মের ফলে তোমার ভিতরে প্রেম বাড়িয়াছে কি? না, অহঙ্কার বাড়িয়াছে? প্রেম যদি বাড়িয়া থাকে, তবে আর তোমার সফলতার বাকী রহিল কি?

আমি কয়েকদিন পরেই তোমাদের মধ্যে পুনরায় আসিতেছি। সেবার যদি জ্ঞানাগ্নিতে চিত্তমল দগ্ধ হইয়া থাকে, তবে এবার প্রেম-বন্যার পলিতে কুসুম-কলি নিশ্চয় ফুটিবে। শুধু নিষ্কাম চিত্তে সকলকে সেবা করিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ওঁ সোণাপুর (জলপাইগুড়ি)
১৬ই ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

নিত্য নূতন স্থানে যাইতেছি, সর্ব্বত্রই বিশাল জনতা, সুদীর্ঘ ভাষণ। অন্যান্য পরিশ্রমের ব্যাপারও আছে। পত্র লিখিবার যে ফুরসুৎই হয় না। সাধনা পরশু মাথায় একটা আঘাত পাইল। তাই আমাকে এখানে একাকী ভাষণ দিতে হইল। পল্লী গ্রামের লোকেরা ঘণ্টা তিন চারি ভাষণ না হইলে যেন বাড়ী হইতে আসা যাওয়ার শ্রমটাকে বৃথা মনে করেন। সুতরাং আমি দুই কি আড়াই ঘণ্টা ভাষণ দিলেই বা কি হইল! ইহাতে যে বন্যার জল-কাদা ভাঙ্গিয়া পাঁচ মাইল হাটিবার শ্রম পোষায় না।

রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত ভাষণ দিয়াছি। তারপরে আসিয়া পত্রের স্তূপ লইয়া বসিয়াছি। জানি, তোমরা পত্র পাইবার জন্য কত আকুল। কিন্তু বাবা, শুধু পত্র পাওয়া আর পত্র পড়াকেই জীবনের নেশা করিও না। যার কাছ হইতে পত্র যাইতেছে, কোন্ দুর্ব্বার প্রেমের আকর্ষণে সে পত্র লেখে আর নিখিল বিশ্বের কুশলের জন্য কোন্ প্রত্যাশা তাহার তোমাদের নিকট, সেই কথাও প্রতি পংক্তিতে প্রতি অক্ষরে স্মরণ করিও।

এদিকে দেশব্যাপী বন্যা, আজ এখানে রেলের ভাঙ্গন, কাল ওখানে যাতায়াতের রাস্তা ভাঙ্গা আর অন্য দিকে চলিতেছে আমার

ও সাধনার অফুরন্ত ভ্রমণ আর ভাষণ। মাঝখানে ফাঁকই যে পাই না তোমাদের নিকটে পত্র লিখিবার। কিন্তু তোমাদের কথা চিন্তা করিবার অবসর ইহার ভিতরেও হইতেছে। তোমাদের কথা না ভাবিয়া আমার যে উপায় নাই। আমি যে প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়িয়াছি। কিন্তু তোমাদের আমি বাঁধিতে পারিলাম কৈ? আমি নিশিদিন তোমাদের কথাই স্মরণ করিতেছি কিন্তু তোমরা আমাকে কয়টী মুহূর্ত্ত স্মরণ কর? দীন-দুঃখী, অন্ধ-আতুর, অজ্ঞ-অধম, হীন-পতিত, দীন-দুর্ব্বল মানবসমাজের ভিতরে যেই আমি লুকাইয়া থাকিয়া নিয়ত তোমাদের হাতছানি দিয়া ডাকিতে চাহিতেছি, সেই আমার জন্য তোমাদের ব্যাকুলতা আসিল কৈ? * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরি-ওঁ

আলিপুরদুয়ার

১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বড় অবেলায় সোনাপুর হইতে রওনা হইয়াছি। আজ এক বিন্দু বিশ্রাম পাই নাই। এখানে আসিয়াই সমবেত উপাসনার সুর শিক্ষাদানে লাগিয়াছি। আরও একদিন আলিপুরদুয়ারে সুর শিখাইবার প্রযত্ন পাইয়াছি। প্রত্যেককে বারংবার বলিতে হইয়াছে,—দেখ, অহমিকা না

কমিলে শিক্ষা হয় না। শিখিতে হইলেই মনে করিতে হয় যে, আমার শিক্ষায় ত্রুটি আছে, সুতরাং আরও যত্ন নিয়া শিখিতে হইবে। সমবেত উপাসনার সুর শিক্ষায় মতলবী বা জেদ-জবরদস্তির স্থান নাই। যাহা নির্দ্ধারিত সুর, তাহাই বিশুদ্ধ ভাবে আয়ত্ত করা চাই। সুর শুদ্ধ ভাবে আয়ত্ত হইয়া গেলে লক্ষ লোক মিলিত ভাবে সমবেত উপাসনায় বসিলেও বৃথা কোলাহল শ্রুত হয় না, শ্রুত হয় এক অত্যদ্ভুত ও অভাবনীয় সমন্বয়পূর্ণ স্তোত্রগাথা। এই কারণেই প্রতি জনকে সমবেত উপাসনার শুদ্ধ সুর শিখিতে আগ্রহী করা প্রয়োজন।

উপাসনার সুরশিক্ষা করা এবং সুরশিক্ষা দান, এই উভয় কার্য্যকেই পরম পুণ্যজনক বলিয়া জ্ঞান করিও। নিজেরা শুদ্ধ ভাবে সুর আয়ত্ত না করিয়া অপরকে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিলে যে ভুল শিখাইবার বিপদ আছে, তাহাও স্মরণ রাখিও। এমন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা আমাদের হওয়া উচিত, যাহাতে বিভিন্ন স্থানের সুরশিক্ষকেরা মাঝে মাঝে একত্র মিলিত হইতে পারেন এবং নিজেদের মধ্যে যে সকল বৈপরীত্য সৃষ্ট হওয়া সম্ভব, তাহা প্রত্যক্ষ আলোচনার দ্বারা মিটাইয়া নিতে পারেন। এইরূপ না হইলে নানা সুরশিক্ষকের শিক্ষাদান একটা হট্ট-কোলাহলের কারণ ঘটাইতে পারে। প্রত্যেকবারের ভ্রমণে কোথাও না কোথাও তাহা উপলব্ধি করিতেছি। কবে যে তোমরা সকলে সর্ব্বত্র আমার অতি প্রিয় সমবেত উপাসনার শুদ্ধ ও নির্ভুল সুর শিখিবার জন্য আগ্রহী ও যত্নপরায়ণ হইবে, আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছি।

এই জেলাটার প্রায় সর্ব্বত্রই তলে তলে কাহারা যেন একটা সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধের চেষ্টা করিয়া যাইতেছেন। ভাষণ-শ্রবণার্থী ও দর্শনার্থী লোকের সংখ্যা দাবাইয়া রাখিবার জন্য কি যেন এক নিদারুণ অধ্যবসায় কোনও একটা ধর্ম্মসঙ্ঘের শিষ্যদের মধ্যে চলিয়াছে। পরিশ্রম ইঁহারা যথেষ্ট করিতেছেন কিন্তু এক সাঁতালি ব্যতীত প্রার্থিত সুফল ইঁহাদের আর কোথাও লাভ হয় নাই। বরং লোকের মুখে শুনিতেছি যে, আমরা যেই সকল স্থানে ভাষণ দিতেছি, তাহার প্রতিটি স্থানে এমন বিপুল জনসমাবেশ হইতেছে, যাহা অতীতে নাকি কেহ কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন না। তবে কেন এই অপপ্রচার-মূলক ব্যর্থ শ্রম?

এই সকল বিপথগামী প্রচারকদের আচরণ তোমাদের যেন কখনও অনুসরণীয় না হয়। তোমরা নিখিল বিশ্বের যাবতীয় সত্যের প্রতি সমান আদরশীল থাকিও। নিজের প্রাপ্ত সাধনে একান্ত নিষ্ঠাবান্ থাকিয়াও যে ভিন্নমতাবলম্বী সাধকদের প্রতি উদার, সহিষ্ণু এবং প্রেমপরায়ণ থাকা যায়, তোমাদের জীবনের দৃষ্টান্তে যেন তাহার পরিচয় নিয়ত পাওয়া যায়। অন্তরে অকপট ভগবদ্‌ভক্তি থাকিলে বিশ্বের সকলকে ভাল বাসিবার ক্ষমতার কখনও অভাব ঘটে না। ভালবাসা এক পরম সম্পদ। ইহার একটী কণা যাহার আছে, সে সহস্র কোহিনূরের মালিক হইয়াছে। প্রেমের সম্পদকে তুচ্ছ করিয়াই ত' আমরা হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষ্যার বশীভূত হই। ভজ শুধু প্রেম, জপ শুধু

প্রেম, লও শুধু প্রেম-নাম। প্রেমকে জীবনের আরাধ্য এবং উপজীব্য কর। প্রেমে ভাস, প্রেমে ডোব, প্রেমে অভেদ-অভিন্ন হইয়া একেবারে লয় হইয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি-ওঁ সলসলাবাড়ী (জলপাইগুড়ি)
১৮ই ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রাতে আলিপুরদুয়ারে একদল দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দিয়া বেলা বারোটায় সলসলাবাড়ী পৌঁছিয়াছি। বিকাল চারিটায় এখানে ভাষণ হইবে। কিন্তু ছিয়াশি জন দীক্ষার্থী দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের প্রয়োজন মিটাইয়া বেলা সোয়া তিনটায় এই পত্র লিখিতেছি। রন্ধন মাত্র চাপিয়াছে। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে ব্রহ্মার্পণ সারিয়া ভাষণ-মঞ্চে দাঁড়াইতে হইবে। অবশ্য, পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ না করিলেই ভাষণ সম্ভব হইবে। কাল রাত্রি এগারটা হইতে কিছুক্ষণ পরে পরেই বর্ষণ চলিতেছে। আজ প্রাতে ও দুপুরে খুব কয়েক কিস্তি বর্ষণ হইয়া গেল। সাধনা এই জন্যই বলিতেছিল যে এত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া একটানা ভ্রমণ চালান বড়ই কঠিন।

সত্যই কঠিন কিন্তু আমরা ত' বসিয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই! কাজ আমাদের করিতেই হইবে। অনুকূল অবস্থা না পাই ত' প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াই কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। বাধা দেখিয়া থামিব, বিঘ্ন দেখিয়া চিন্তিত হইব, বজ্র-বিদ্যুৎ দেখিয়া চমকিত, উচ্চকিত, উৎকণ্ঠিত হইব, ইহা কখনও আমাতে সম্ভব নহে। তাই কাজ করিয়া যাইতেছি। ফল কোথাও বিপুল হইতেছে, কোথাও কিছু হয় নাই কিন্তু ফলাফলের চিন্তা করিয়া কি আমরা কাজে নামিয়াছি? কাজ করিবার প্রয়োজন বলিয়াই কাজে নামিয়াছি, ফলের লোভে নহে।

ভাল কথা। মস্ত বড় একটা সংবাদ তোমাকে জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছি। পুপুন্‌কী আশ্রমের মঙ্গল-দীঘীর মাটি কাটিয়া এক পার হইতে অন্য পারে নিবার জন্য নৌকার প্রয়োজন গত বৎসরই অনুভূত হইয়াছিল। মিস্ত্রীর খোঁজ পাই নাই। আলিপুরদুয়ারে আসিয়া এক চমৎকার প্রস্তাব পাইলাম। দুইখানা নৌকা তৈরী হইয়া এখান হইতে রেলে সোজা ধানবাদ বা মহুদা চলিয়া যাইবে। টাঙ্গাইলের সুদক্ষ অনেক নৌকার মিস্ত্রী এখানে আসিয়াছে। শুনিয়া সুখী হইলাম, চিন্তিতও হইলাম। যেই দেশে বিনামূল্যে ঔষধ নিতে আসিয়া রোগীরা কেহ কেহ আশ্রমের থালা, ঘটি, বাটি এবং বিড়াল-কুকুরের বাচ্চা চুরি করিয়া নিয়া যায়, যেই দেশে বিগত বত্রিশটী বৎসরের একটী বর্ষও আশ্রমের ফুল-বাগানের বেড়ার শত শত খুঁটির মধ্যে

দুই দশখানা খুঁটিও ইহাদের হাত হইতে রেহাই পায় নাই, সেই দেশে উনান ধরাইবার খড়ির অভাব পূরণের জন্য যদি আশ্রমের নৌকা কুঠারে কাটিয়া লোকে কাঠ নিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার প্রতীকার কি হইবে? অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চৌর্য্য-প্রবৃত্তি অভাব হইতে সৃষ্ট হয় কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে চৌর্য্য-প্রবৃত্তি একটা মানসিক ব্যাধিও। অভাব নাই, তবু চুরি করে, ইহা মনের রোগের লক্ষণ। যে পরিমাণ পরিশ্রম করিলে স্বাভাবিক নিয়মেই অভাব দূর হইতে পারে, তার দশগুণ পরিশ্রম করিতে হইলে চুরি করিয়াই বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে, ইহাও মানসিক অসুস্থতার পরিচায়ক। একবার আমি মৌনী অবস্থায় পুপুন্‌কী হইতে কলিকাতা রওনা হইয়াছিলাম। আমি যে কিছুদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছি, এই সংবাদ লোকেরা আগেই জানিয়াছিল। আমি আশ্রম ছাড়িয়া কিছু দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই আশ্রমের কোদাল, কুড়াল, শাবল, দা, কলসী, খন্তা, কড়াই সব লুণ্ঠিত হইয়াছিল। বেলা তখন দুটা। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড দিবালোকে লজ্জাহীন সাহসে এই অপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাগ করি নাই কিন্তু দুঃখবোধ হইয়াছিল। বারাণসীর গাণ্ডীব পত্রিকায় একটী চমৎকার সংবাদ বাহির হইয়াছে। পাতিয়ালাতে স্বাধীনতা-দিবসে একটী সততা-পরীক্ষার দোকান খোলা হইয়াছিল। পাঁচশত টাকার মালে দোকান সাজাইয়া জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা যেন নির্দ্দিষ্ট বাক্সে টাকা রাখিয়া যাঁর যাঁর পছন্দমত জিনিষ কিনিয়া নেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দোকানে কোনও বিক্রেতা উপস্থিত ছিলেন না। সারাদিন ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী ও দালালদের ভিড় দেখা গেল। সন্ধ্যার পরে বাক্স খুলিয়া দেখা গেল, মাত্র পঁয়তাল্লিশটী টাকা সেখানে পড়িয়াছে। দোকানে কোনও জিনিষই পড়িয়া নাই। কেহ না কেহ কোনও না কোনও জিনিষ নিয়া সমগ্র দোকান সাবাড় করিয়াছেন কিন্তু চারিশত পঞ্চান্ন টাকার মাল চৌর্য্য দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। এই চুরি কোনও অভাবগ্রস্ত লোকেরা করে নাই। করিয়াছে শিক্ষিত ও সম্পন্ন লোকেরা। ইহা কি মানসিক ব্যাধিসঞ্জাত নহে?

চুরি পাপ কিন্তু স্থলবিশেষে তাহারও ক্ষমা থাকা উচিত। কিন্তু পুপুন্‌কী আশ্রমের বেড়ার খুঁটি দিনের পর দিন যে পরিমাণ অধ্যবসায় করিয়া চোরেরা অপহরণ করিতেছে, তার অর্দ্ধেক শ্রমে ইহার দশগুণ কাষ্ঠ ইহারা সততার মধ্য দিয়া আহরণ করিতে পারে। শ্রম করিল দ্বিগুণ, অর্জ্জন করিল একদশমাংশ, আর সঙ্গে সঙ্গে পাপের হইল ভাগী। ইহাদিগের জন্য কাহার না করুণা হইবে? আলিপুরদুয়ার আশ্রমে নৌকা দুইখানা পাঠাইবে, তাহা এই সকল হতভাগ্যদের পাপ-সংগ্রহের প্ররোচক হইয়া দাঁড়াইবে কিনা, ইহা ভাবিয়াই আমি অধিক আকুল হইয়াছি।

নৌকা দুইখান পুপুন্‌কী আশ্রমে গিয়া পৌছা মাত্র যাহাতে মাটি কাটার কাজ সুরু হইয়া যায়, তাহা করিতে হইবে। এবার ঐ অঞ্চলে বৃষ্টি আদৌ হয় নাই। দুর্ভিক্ষে এবার অনেক লোক মারা পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সাধ্যমত যতগুলি লোককে সম্ভব, আমরা কাজ

দিব। নিজেরাও শ্রম করিব। যেখানে আমাদের যে কর্ম্মকেন্দ্র রহিয়াছে, সকল স্থানে পত্র দিয়া দাও যেন প্রত্যেক স্থানের সদুপায়ে অর্জ্জিত প্রতি কণা অর্থ পুপুন্‌কী আশ্রমে চলিয়া আসে। একবার আমিই ঐ দেশে কর্ম্মদানের আন্দোলন করিয়া দুর্ভিক্ষ দমন করিয়াছিলাম। এবার দেশের রাষ্ট্রিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেও সেই প্রয়োজন একেবারে ফুরাইয়া যায় নাই। দেশে দুর্ভিক্ষ আসিলে, ভিক্ষা বিতরণের দ্বারা নহে, কর্ম্মক্ষমকে কর্ম্ম দিয়াই যে তাহা নিবারণ করিতে হয় এবং দেশ স্বাধীন হউক আর পরাধীন থাকুক, সর্ব্বাবস্থাতেই যে জনসাধারণের প্রতি জনসাধারণের কর্ত্তব্য অতি বিরাট ও অপরিহার্য্য, এই বিশ্বাস সকলের মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবারই জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির সুষ্ঠতম বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রেমহীন হইলে তোমরা আমার এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাই এই অবসরে তোমাদিগকে চৌর্য্যপরায়ণ আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এই উভয় শ্রেণীর মানুষদের প্রতি প্রেমপরায়ণ হইতে বলিতেছি। এই আশ্রমেরই সাতটী কর্ম্মীর মাথা-কপাল ফাটাইয়া হাত-পা ভাঙ্গিয়া দিয়া যেদিন ডাকাতে করিয়াছিল উৎপীড়ন, সেদিন কিন্তু আদালতে গিয়া আমরা অপরাধীদের মুক্তকণ্ঠে মার্জ্জনা করিয়া আসিয়াছিলাম। আমাদের সেই প্রেমের ঐতিহ্য আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরি-ওঁ আলিপুরদুয়ার
১৯শে ভাদ্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সলসলাবাড়ীর ভাষণ সারিয়া রাত্রেই এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি চতুর্দ্দিকে মানুষের দুর্গতির নানা রূপ দেখিয়া চিত্তে বেদনা পাইতেছি। তদুপরি জল-ঝড়-বৃষ্টি এবং বন্যা যেন সোনায় সোহাগা হইয়াছে। আরও চমৎকার এই যে, কোনও একটা ধর্ম্মসঙ্ঘ নিজেদের সঙ্ঘকে বিস্তারিত করিবার প্রয়োজন-বোধের ভ্রান্ত প্রেরণায় গ্রামে গ্রামে অপকথা কহিয়া বেড়াইতেছেন। ওঙ্কার-সাধনা করিলে নরক হয়, রোগ হয় আর রক্তমাংসের দেহধারী মানুষকে অবতার ভাবিয়া তনু-মন-ধন তাঁহাতে সমর্পণ করিলে মুক্তি হয়। এই সকল প্রচারণা কত সরল-চিত্ত সাধুভাবাপন্ন অশিক্ষিত মনকেও করিতেছে বিষাক্ত এবং বিদ্বিষ্ট। যাহারা গাহিয়া যাইতেছে পরম সাম্যের গান, যাহারা প্রচার করিতেছে অসাম্প্রদায়িক আদর্শবাদ, যাহারা জগতের প্রতি মত ও প্রতি পথের প্রতি মানুষমাত্রেরই শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যুগপৎ সকল পথাবলম্বীদের চাহে অভ্যুদয়, যাহারা মানুষকে, সম্প্রদায়-বিশেষের অনুবর্ত্তী বলিয়া নহে, মানুষ বলিয়াই করিতে চাহে পূজা, তাহাদের নির্ব্বিরোধ মানব-প্রেম-প্রচারকে বিকৃত অপব্যাখ্যার দ্বারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধভাবে ব্যহত করিবার এই প্রয়াসের হেতু কি, ভাবিয়া দেখিও। এই সকল অজ্ঞানেরা মনে করেন যে, চালাকি দিয়া

চিরকাল পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডের মানুষকে ভুলাইয়া রাখা যাইবে। আর, আমরা চাহিতেছি, দাসত্বমুক্ত স্বাধীন সবল মানুষের মনকে বিশ্বের প্রতি মানবের কল্যাণের জন্য করিতে উদ্যত ও প্রয়াসী।

কাল সলসলাবাড়ী হইতে ফিরিবার কয়েক ঘণ্টা পর হইতেই দারুণ বৃষ্টিপাত সুরু হইয়াছে। আজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। এই দিন প্রতি বৎসরই বৃষ্টি-বাদল হয়। সারাদিন বৃষ্টি চলিয়া বিকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছিল। সাধনা তাহার দেড় ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ শেষ করিবার পরে আমি দাঁড়াইলাম। ম্যাক্-উইলিয়াম হাইস্কুলের মাঠ কাণায় কাণায় লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। বিশ মিনিটও বলি নাই, এমন সময়ে দারুণ বর্ষণ সুরু হইল। সভাপতি প্রিন্সিপ্যাল লাহিড়ী জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, এত কষ্ট করিয়া জলে ভিজিলে অনেকের অসুখ হইবে, সুতরাং সভাভঙ্গ করা হউক। জনতা সে কথায় আমলই দিলেন না। কিছু লোক এদিকে সেদিকে সরিয়া গেলেও অধিকাংশ জনতা বসিয়া রহিলেন, অনেকে মাটি ভিজার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। আড়াই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভাষণ চলিল। চিত্রাপিতের মত সকলে নিঃস্তব্ধ হইয়া শুনিলেন। দুই চারিটি অশিক্ষিতা মহিলা ব্যতীত আর কেহ কোনও গোলমালই করেন নাই। কে দিল ইঁহাদিগকে এই ধৈর্য্য? এমন করিয়া আর ত' কখনো কাহারো ভাষণ ইঁহারা শোনেন নাই! কেন এই আগ্রহ আর উদ্দীপনা? ইঁহার কি কোনও সঙ্গত কারণ নাই?

আছে। মুখে মুখে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ের কথা বলিয়া যাহারা নিজেদের সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করিবার প্রয়োজনে যুক্তি ও বুদ্ধির

মুখে ছাই ঢালে, আমরা তাহাদের সগোত্র নহি। পেটেন্ট করা ত্রাণকর্ত্তা বাহির করিয়া যাহারা জগতের সকল প্রাণীকে তাহারই পদনখানত করিয়া মানবাত্মার দাসত্ব-সংস্কার পাকাপোক্ত করিয়া দিয়া ইহার সুযোগে ধনাগমের ব্যবস্থা করিতে চাহে, আমরা তাহাদের চরিত্রানুবর্ত্তন করি নাই। যে যেই ধর্ম্মমতেই থাকুক, মানুষ হিসাবে সে খাঁটি হইলে আমাদের দৃষ্টিতে তাহাতেই তাহার আদর। আমরা ধর্ম্মবিশেষ প্রচার করিতে আসি নাই, মানুষের মনুষ্যত্বকে পূজা করিতে বাহির হইয়াছি। মানুষকে কর-চরণে শৃঙ্খলিত করিয়া দাসত্বের নিগড়ের চাপে কণ্ঠাগত-প্রাণ করিবার চেষ্টাকে আমরা পাপ বলিয়া মনে করি।

জনতার আগ্রহের কারণ ইহা।

জনগণের প্রকৃত স্বার্থ মানুষ হইবার ভিতরে, নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অন্যান্য সঙ্ঘের সহিত সংগ্রাম পরিচালনে নহে। জনগণের প্রকৃত সার্থকতা বিশ্বের প্রত্যেকটী মানুষের সহিত অন্তরের আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়া সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে জীবনের পরমরমণীয় সৌধ রচনা করিবার ভিতরে। যে মানুষ সকল মানুষের ভিতরে নিজের আত্মীয়টীকে খুঁজিয়া পাইল না, সে ত' বন-মানুষ বা অরণ্যের জন্তু-জানোয়ার মাত্র। তেমন অসম্পূর্ণ মানুষদের লইয়া চির-অগ্রগতিশীল মানব-সভ্যতা কি করিবে? মানুষের মুখস পরিয়া ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানবের দল প্রলয়-তাণ্ডবে নাচিবে আর অন্য মানুষদের চিত্ত ভরিবে বিষাদে, অন্তরে ঢালিবে তিক্ততা, প্রাণে করিবে ত্রাসেরই কেবল সঞ্চার,—সাম্প্রদায়িক ধ্বজার দোহাই দিয়া ধর্ম্মসঙ্ঘ বিশেষের

এই অন্যায়কে কেন মানব-সভ্যতা সহ্য করিবে? মানুষকে আমরা মানুষ দেখিতে চাই, সে কোন্ ধর্ম্মসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সাধন-ভজন করিয়া নিজের আন্তরিক ধর্ম্ম-পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, তাহার বিচার-বিতর্কের ভিতরে মাথা গলাইয়া নিজেদের জীবনের মূল্যবান্ সময় এবং ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় আমরা করিতে চাহি না। মানুষের প্রতি প্রেম আমাদিগকে এই সকল ধর্ম্মাধর্ম্মির দ্বন্দ্বকলহ হইতে দূরে থাকিতে প্রেরণা দিতেছে। এই কারণেই আমাদের ভাষণ দুর্ব্বার, দুর্দ্দমনীয় ও শাশ্বত আবেদন লইয়া মানবের মনকে স্পর্শ করিতেছে। মনে রাখিও প্রতিষ্ঠার লোভে বিপথে পাদচারণা করিলে আমাদের চলিবে না, মানব-প্রেমের অকলঙ্ক সত্যে দেহ-মন-প্রাণের বিনিময়েও আমরা চিরস্থির থাকিব। সাম্প্রদায়িকতার ধ্বজা ধরিয়া আমরা আমাদের ধর্ম্মাভিযান পরিচালন করিব না, সকল ধর্ম্মকে সকল ধর্ম্মমতকে মানব-প্রেমের নিরিখে ওজন করিয়া আমরা সম্মান করিব। আমি নিজে নির্দ্দিষ্ট কোনও ধর্ম্মসঙ্ঘভুক্ত বলিয়াই আমার ধর্ম্মমতই শ্রেষ্ঠ, ইহা নিতান্তই ন্যায়শাস্ত্রবিরোধী যুক্তি। ধর্ম্মমত মানুষকে মানুষ করে, অমানুষ করে না, দিব্য প্রেমের অধিকারী করে, পাশববৃত্তির ক্রীড়নক করে না, সর্ব্বজনের সুখে আত্মদানে প্রেরণা দেয়, আত্মসুখে প্রমত্ত করে না— এইখানেই ত' তাহার প্রকৃত সার্থকতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরি-ওঁ আলিপুরদুয়ার

২০শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পূজার বিগ্রহ দক্ষিণ দিকে স্থাপন করিয়া সংশয়ে পড়িয়াছ যে, দক্ষিণ্যাস্য হইয়া ভগবদুপাসনা কর চলিবে কিনা। বলাই বাহুল্য, ভগবান্ সকল দিকেই আছেন এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবার পক্ষে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সবই সমান।

তথাপি এক এক দেশে এক এক কারণে এক দিককে অধিকতর প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কোনও একটা বিশেষ কারণকে আশ্রয় করিয়া এক এক দেশে এক একটা দিককে প্রধান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিই অধিক বলিয়া মনে হয়। এক দিন হয়ত তাহার সমর্থনে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিও বাহির হইবে। কিন্তু তাহা হউক আর না হউক, যেই দেশে যেই সমাজে ঈশ্বরোপাসনা সম্পর্কে যেই দিকটীকে প্রশস্ত বলিয়া মনে করা হয়, সামাজিক ও সার্ব্বজনিক অনুষ্ঠান সমূহে সেই দিকটীর সম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল দিকেই ঈশ্বর আছেন জানিয়া তোমার ব্যক্তিগত উপাসনা-কালে নিজ সুবিধামতন দিকটীতে বিগ্রহ স্থাপন করিতে পার।

বাহ্য ঢং ও অন্তরের প্রেম এক জিনিষ নহে। বাহ্য ঢংএ লোকপ্রচলিত বিশ্বাসের সহিত কিছু অমিল থাকিলেও অন্তরের প্রেম

দিয়াই তোমার আধ্যাত্মিক কার্য্যের বিচার হইবে। তোমরা পরমপ্রেমিক হও, পরমেশ্বরের প্রেমে একেবারে ডুবিয়া যাও। প্রেমই তোমাদের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহে জনসাধারণের প্রচলিত রুচির সহিত বৃথা সংগ্রাম করিয়া আয়ুক্ষয় ও শক্তির অপচয় করিও না। অপরের সহিত বিরোধ ও সংঘর্ষ-বর্জ্জন করিয়া নির্ব্বিরোধ প্রেমময় জীবন যাপন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরি-ওঁ আলিপুরদুয়ার

২০শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল সন্ধ্যা হইতে প্রবল বর্ষণ চলিতেছে। এখনো বিরাম হয় নাই। এখনি গোয়ালপাড়া জেলার বঙ্গাইগাঁও রওনা হইতে হইবে। সাধনা আর অঞ্জন জিনিষপত্র গুছাইতেছে। আমি স্তূপীকৃত চিঠির জবাব দিবার ফাঁকে ফাঁকে ঘর হইতে বাহির হইয়া অভ্যাগত ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া আসিতেছি।

ট্রেণ ধরিবার প্রয়োজনে যাহাকে অনেক সময়ে আহার না করিয়াই ছুটিতে হয়, সময়ানুবর্ত্তিতার অনুরোধে যাহাকে দীর্ঘপথ পর্য্যটনের পরে আহার বা বিশ্রাম না করিয়াই বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া

অগণিত নরনারীর আগ্রহের সম্মান রাখিতে হয়, তাহার কাছে যদি তোমরা এই সংবাদই পরিবেশন কর যে, তুচ্ছ আত্মাভিমান নিয়া তোমাদের মণ্ডলীর উৎসাহী কর্ম্মীরা পরস্পরের সহিত হানাহানি করিতেছে, তাহা হইলে মনে কি সন্তোষ আসিতে পারে? তোমাদের স্থানগুলিতে তোমরা আমাকে মাথা-কপাল কুটিয়া এক একটা ভ্রমণ-তালিকা করিতে বাধ্য করিয়া আসিতেছ। ভ্রমণ-কালে অন্য পাঁচটা স্থানের সঙ্গে তোমাদেরও প্রতিটি স্থান যুক্ত না হইলে তোমরা কাঁদিয়া কাটিয়া অধীর হও, কোথাও কোথাও দলবদ্ধভাবে অনশনের সঙ্কল্প কর। আমি বেগতিক দেখিয়া জীবনের একটী কি দুইটী দিনের পরমায়ু অনিশ্চিতের হাতে সঁপিয়া শ্রম করিবার জন্য তোমাদের স্থানগুলিতে ছুটিয়া যাই। আমি চলিয়া আসার পরে যদি তোমরা কর পরস্পরে কলহ, তবে আমাকে সান্ত্বনা দিবে কোন্ কথায়? আমি কি একটা করিয়া মণ্ডলী গঠন করিয়া যাইতেছি তোমাদের কলহ করিবার আড্ডা বাড়াইবার জন্য? ভাবিয়া আমি স্থির করিতে পারিতেছি না যে, তোমাদের এই কুকীর্ত্তি দূর হইবে কবে? যতই উপদেশ দিতেছি, ততই যেন তোমরা বেপরোয়া হইতেছ। অন্তরে আসিতেছে না লজ্জা, আসিতেছে না অনুতাপ। আগুনে পুড়িলে যে লোহা হয় না লাল, তাহাতে হাতুড়ি ঠুকিয়া লাভ কি?

স্বাধীনতা-দিবসে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা জগতের তথা ভারতের মঙ্গলকামনায় তোমাদিগকে সমবেত উপাসনা এবং হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন জানিয়া সুখী হইলাম। আরও সুখী হইলাম ইহা জানিয়া যে, তোমরা যথাযোগ্য ভাবে এই আহ্বানে

সাড়া দিয়াছিলে। এমন আহ্বানে সাড়া দিবে না ত' কি বসিয়া থাকিবে? তোমরা জগন্মঙ্গলের সাধক, তারই জন্য তোমরা ভারতের প্রকৃত মঙ্গলকারী। ভারতের মঙ্গলের সহিত জগতের মঙ্গল ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। যে মঙ্গলে জগতের অমঙ্গল, ভারত তাহা চাহে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও আমরা অনেক অকীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়াছি। এই বিষয়ে জগৎটা হইতে ভারতবর্ষকে আলাদা এক আশ্চর্য্য দেশ বলিয়া ভাবিবার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াও ভারতের সাধনা উত্তুঙ্গ হিমালয়ের প্রস্তরপুঞ্জের মধ্য দিয়া আর এক অপরূপ মহিমা অর্জ্জন করিবার পথ খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। সেই মহিমা জগন্মঙ্গলের, সেই সাধনা বিশ্বের সকলের সহিত একাত্মবোধের। নিখিল ভুবনের মঙ্গলের সহিত বিরোধ করিয়া ভারতীয় মানবাত্মা নিজের মঙ্গল পাইতে চাহে না। ভারতবর্ষের ইহা বিশেষত্ব, ভারতীয় সাধনার ইহা মর্ম্মকথা।

এই দিবসের হরি-ওঁ কীর্ত্তনে স্থানীয় মুসলমানরা পর্য্যন্ত সম্মতি দিয়াছেন, এই সংবাদ অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তাঁহারা হরি-ওঁ নামটুকুর অর্থ জানেন না, এজন্য এই কীর্ত্তনে তাঁহারা যোগ দিতে পারেন না। তাই তাঁহারা কীর্ত্তনে যোগ দেন নাই বলিয়া তোমাদের দিক হইতে কোনও অভিযোগ সঙ্গত হইত না। আর যদি তাঁহারা হরি-ওঁ শব্দটীর অর্থ জানিতেনও এবং যদি বুঝিতেনও যে ইহা কোনও সাকার প্রতিমার নাম নহে, ভগবানের সর্ব্বাত্মক একটী নাম, তথাপি তাঁহারা নিজেদের পন্থের প্রতি বিপুল নিষ্ঠা বশতঃ অন্য রকমের কাজে নিজেদের লিপ্ত করিয়া নিষ্ঠার মধ্যে ফাঁক বা ত্রুটি আনিতে সম্মত

হইতেন না। নিজের পন্থের প্রতি একজন মুসলমানের যেরূপ সুদৃঢ় নিষ্ঠা, অনুরাগ ও বিশ্বাস, তাহা তাঁহাকে অপর মতে অপর পথে ভগবানকে ডাকিতে নিরুৎসাহ করিয়া থাকে। ইহাকে মুসলমানের দোষ না ভাবিয়া গুণ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে লোকলজ্জায় আপোষ করার প্রবৃত্তি ইষ্টনিষ্ঠার হানিজনক। সুতরাং তোমাদের হরি-ওঁ কীর্ত্তনে মুসলমান ভদ্রলোকেরা সম্মতি জানাইয়াও নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে কেহ যোগদান করেন নাই শুনিয়া সুখীই হইয়াছি। ইহার মধ্য হইতে অসুখী হইবার কারণ কিছুই পাইলাম না। চাঁদপুরের এক মৌলভী সাহেব হরি-ওঁ কীর্ত্তনে যোগ দিতেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে আল্লায় নিষ্ঠাহানির হেতু নাই। আবার, কাছাড়ের একটী পীরবংশীয় মুসলমান ছেলেকে আমাদের হরি-ওঁ কীর্ত্তনে যোগদানে উৎসাহিত করি নাই, কারণ তাঁহার স্বসম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য নরনারীরা ইহাকে নিষ্ঠাচ্যুতি বা মোনাফেকি মনে করিয়া অযথা অশান্তি সৃষ্টি করিবেন। সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনাগুলিকে যথাসাধ্য দূরে রাখিয়াই তোমরা চলিবে। তথাপি যদি উৎপাত আসে, তখন পাঞ্জা অবশ্যই শক্ত করিতে হইবে।

অপরাপর সংবাদ যাহা যাহা দিয়াছ, তাহাতে সুখী হইলাম। যদিও একতা নাই, তবু ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা তোমরা কেহ কেহ করিতেছ, তাহা বড়ই মূল্যবান। একতা নাই বলিয়াই এই চেষ্টার প্রয়োজনীয়তাও অতি অসাধারণ। ঐক্য-প্রতিষ্ঠার এই চেষ্টার মধ্যে যদি থাকে তোমাদের অকপট সেবাবুদ্ধি ও প্রেম এবং যদি না

থাকে কর্ত্তৃত্বের অহমিকা ও প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠার গুপ্ত কামনা, তাহা হইলে ইহা ফলবতী হইতে বাধ্য। অনেক কৌশল দ্বারা যে কার্য্য আয়ত্ত হয় না, খাঁটি নির্ভেজাল অকপট প্রেম দুই এক বিন্দু থাকিলে, তাহা দ্বারাই সেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। প্রেম আর অমৃত সমান বস্তু জানিও। ইহাদের অতি ক্ষুদ্র এক এক বিন্দু এক এক মহাসিন্ধুর মত বিশাল, বিরাট, ব্যাপক ও মহান্। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরি-ওঁ বঙ্গাইগাঁও (গোয়ালপাড়া)

২০শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজণেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই সঙ্গে তোমার এক গুরুভ্রাতার লিখিত পত্র পাঠাইলাম। তাহা পাঠে অবগত হইবে যে, তোমাদের মণ্ডলীতে মাত্র দুইজন উৎসাহী কর্ম্মীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা ও গুণগ্রাহিতা না থাকায়, মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যেরা কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় লক্ষ্যহীন ভাবে চলিয়াছে এবং তোমাদের মণ্ডলী স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিকটে যে শ্রদ্ধা পাইত, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহা ক্ষতিকর হইলেও ইহাকে আমি তত ক্ষতি বলিয়া বিবেচনা করি না, যতটা ক্ষতি হইয়াছে তোমাদের নিজেদের আত্মশ্রদ্ধা নাশের ফলে।

তোমরা নিজেরা নিজেদের কাছে খাটো, ছোট, হেয় ও অবজ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছ।

এই অবস্থার প্রতীকার প্রয়োজন।

তুমি বা তোমার প্রতিদ্বন্দী নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে বড় করিতে গিয়া উভয়েই নিজেদের অত্যন্ত ছোট করিয়া দিয়াছ। তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত অভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া, সকলের যে তোমরা সেবক দ্রুত এই মনোভাবের অনুশীলনে ব্রতী হও। অন্তরে তোমাদের সেবকের ভাব নাই, রহিয়াছে, অদমিত মান-যশ-কর্ত্তৃত্বের স্পৃহা। তাহারই জন্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে তোমরা মান-সম্মানের প্রশ্ন তুলিতেছ এবং এই উপলক্ষে দলাদলি সৃষ্টি করিয়া একটী সচল, জাগ্রত, সুন্দর জয়রথকে অচল, নিষ্কর্ম্মা, কদর্য্য জিনিষে পরিণত করিতেছ। তোমাদের দলাদলি তোমাদের পূজাপীঠকে মেছো হাটে পরিণত করিতেছে। এই দুর্ভাগ্য হইতে তোমরা তোমাদের মণ্ডলীকে অচিরে মুক্তিদান কর। হয় তোমরা মণ্ডলী একেবারে উঠাইয়া দাও, নয় তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ অপরিচ্ছন্ন চিন্তা এবং প্রবৃত্তিকে চিরতরে বিসর্জ্জন দাও। এই দুইটীর একটী পথ তোমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। হিংসা-বিদ্বেষ-জর্জ্জর চিত্ত লইয়া তোমরা তোমাদের মণ্ডলীকে কোনও উন্নত লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিবে না, ইহা বিশ্বাস কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি-ওঁ আলিপুরদুয়ার জংশন (জলপাইগুড়ি)
২১শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ভিতরে আমি ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছি। সহস্র জনের ত্যাগে যে অর্থ আসিয়াছে, তাহা যে তোমারই দানের জয়ধ্বজা, এই প্রচারটুকু করিবার সুযোগ হ্রাস পাইবার পর হইতে তোমার কাজে অরুচি ধরিয়াছে। পরের কৃতিত্বকে নিজের বলিয়া চালাইবার রেওয়াজ প্রায় সব দেশেই আছে, যদিও তাহা অতিশয় আপত্তিজনক। কিন্তু পরের ত্যাগকে নিজের ত্যাগ বলিয়া জাহির করিতে যাওয়ার ভিতরে যে মূঢ়তা রহিয়াছে, তাহার বোধ হয় কোনও তুলনা নাই। তোমার সাম্প্রতিক এই মনোবিকারে আমি তোমার সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

দেশ ও সমাজে তোমার দানের অনেক খ্যাতিই হইয়াছে। কেহ কেহ সেই সকল দানের জন্য তোমাকে যথোচিত শ্রদ্ধাও করিয়া থাকে। তোমার হস্ত-বিনির্গত কয়েক লক্ষ টাকা জনগণের দুঃখ বিদূরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে তোমার যথেষ্ট যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছে। সেই প্রতিপত্তিটুকু সামান্যও নহে, সাধারণ নহে। তুমি যদি সেই প্রতিপত্তি জনিত অনুকূল পরিবেশটুকুর মধ্যেই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সৎ, সাধু ও ন্যায়াভ্যাসী বলিয়া সম্মানিত হইবার পথ উন্মুক্তই ত' ছিল।

কিন্তু তুমি তাহা পছন্দ কর নাই। তুমি অপর সহস্র জনের দান ও ত্যাগের শুভফলকে তোমারই দান ও ত্যাগ বলিয়া জাহির করিতে যাইয়া প্রকৃত ত্যাগীদের সম্মান কমাইয়া দিয়াছ। আমার মতে ইহা তোমার একটী গুরুতর অপরাধ। এইরূপ অপরাধে প্রবণতা থাকা কোনও ভাল কথা নহে। তুমি এখনও আত্মসংশোধনের চেষ্টায় ব্রতী হও।

এক শ্রেণীর জুয়াচোর আছে, যাহারা সৎকাজ করিয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং শ্রদ্ধার আসনে বসিবার পরে নূতন নূতন শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়। গৃহী ব্যবসায়ীদের মধ্যে যেমন ইহা দেখা যায়, ত্যাগরঞ্জিত সন্ন্যাসসুন্দর গৈরিক ধারণ করিয়া ধর্ম্মব্যবসায়ীরাও অনেকে তাহা করেন। এই উভয় শ্রেণীর লোকই সমাজের শত্রু। যশ অর্জ্জন করিলেই জগতে কেহ বড় হয় না। যে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে নাই, সে যশস্বী না হইলেও সমাজের বান্ধব।

তুমি নিজে কি টের পাইতেছ না যে, যাহারা খুব খাতির করিয়া তোমার সহিত কথা বলে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই তোমাকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করে?

তোমার প্রতি লোকের এই অবজ্ঞা দেখিয়া আমার প্রাণ দুঃখে বিগলিত হয়। কারণ, আমি তোমাকে ছোট করিয়া দেখি না। তোমার অন্যায় ও অপরাধ আমাকে ব্যথিত করে কিন্তু তোমার প্রতি আমাকে বিদ্বিষ্ট করে না।

তাই আমি নিয়ত তোমার কুশল কামনা করিতেছি এবং চাহিতেছি যে, তোমার অপূর্ব্ব কর্ম্মক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হউক সত্য, প্রেম

ও পবিত্রতার উপরে। জগতে কর্ম্মক্ষম পুরুষ অনেকেই জন্মিয়াছেন কিন্তু প্রেমিক পুরুষ কয়জন? সত্যশীল আর পবিত্রচেতাই বা কয়জন? আমি তোমাকে কখনও ছোট করিয়া দেখি না। আমি চাহি তুমি জগতের এক দুর্ল্লভ রত্নে পরিণত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরি-ওঁ

ফকিরাগ্রাম (গোয়ালপাড়া)
২৩শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তাঁতির মাকুর মত একবার এদিক একবার সেদিক ছুটিতেছি। যাঁদের যেই বারটী সুবিধা, তাঁদের স্থানে সপ্তাহের সেই বারটী বাছিয়া হাজির হইতে হইতেছে। কোনও স্থানের উদ্যোক্তরাই ভাবিতেছেন না যে, প্রত্যেক স্থানেই তাঁদের সুবিধামত বারে যাইতে হইলে আমাদের প্রাণ থাকে না। প্রকৃত কথা কহিতে কি, এইবারকার ভ্রমণ বড়ই প্রাণান্তকর হইয়াছে। আহার ফেলিয়া ট্রেণ ধরিতে ছুটিতে হইতেছে প্রায় প্রতিদিন অথচ অত হুড়াহুড়ি করিয়া যে যে স্থানে গিয়া হাজির হইতেছি, সেখানে যাওয়া মাত্র দশ বিশ পঁচিশ মিনিটের বিশ্রাম বা অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যাপার সম্ভব হইতেছে না। সবাই হুজুগ করিয়া ভিড় করিয়া অনাবশ্যক আড়ম্বর ও হুড়াহুড়ি করিয়া উৎসব জমাইতেছেন কিন্তু অকারণ ক্লান্তি ও অনুচিত বিশ্রামহীনতায় ক্ষয়

হইয়া যাইতেছে কর্ম্মীদের পরমায়ুর দিনগুলি। অথচ এই দেশে জনসেবা করিতে হইলে এই আয়ুক্ষয় স্বীকার না করিয়াই বা কি করিব? কোনও নেতাই ত' উচ্ছৃঙ্খল ভারতবাসীকে শৃঙ্খলা শিখাইতে পারিলেন না। আমিই কি পারিব? সুতরাং নিজের পরমায়ুক্ষয় সম্পর্কে উদ্বেগ ছাড়িয়াই দিয়াছি।

ফকিরাগ্রাম ক্ষুদ্র স্থান। সুতরাং মনেই করিতে পারি নাই যে, এখানে আবার সভাস্থলে অত জনতা হইতে পারে। ভাষণ-শেষে যখন সাপটগ্রামের শিক্ষক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আসিয়া দেখা করিলেন, তখন প্রকৃত ব্যাপারটা মালুম হইল। সাপটগ্রাম এখান হইতে সাড়ে পাঁচ মাইল দূর। সেখান হইতে এখানে আসিবার মটরপথ প্রায় বিশ মাইল। কিন্তু সাপটগ্রামের দুইটী হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়েরা নিজেদের স্কুল বেলা একটায়ই ছুটি দিয়া দিয়াছেন। ছাত্রদল রেললাইন ধরিয়া সাড়ে পাঁচ মাইল পথ পায়ে হাটিয়া বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছে। চারি পাঁচ শত ছাত্রের সমাগমে স্বভাবতঃই স্বভাস্থল জমজমাট হইয়াছে। মাষ্টার মহাশয়দের সহিত আলাপ হইল। বুঝিলাম, ছাত্রসমাজের প্রকৃত কুশলের চিন্তা ইঁহারা করিতেছেন এবং অভিভাবক-সম্প্রদায়েরও পরিপূর্ণ সমর্থন ইঁহারা পাইতেছেন। মাষ্টার মহাশয়েরা রেলের ট্রলিতে রাত্রেই সাপটগ্রাম ফিরিয়া গেলেন, ছাত্রদেরও অনেকে পদব্রজে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। এখানকার স্থানীয় উদ্যোক্তারা বাকী ছাত্রদের এখানে রাত্রে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

সাপটগ্রাম আমাদিগকে সত্যই আকর্ষণ করিতেছে।

আর একটী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, আঠারো উনিশ মাইল দূরবর্ত্তী সাঁওতালপল্লী লড়িয়াডাঙ্গা গ্রেফাঙ্গুরির সাঁওতাল-নেতা শ্রীরাইসিং বিছরার আবেদন। সাঁওতালরা অনার্য্য-বংশোদ্ভব। কতক খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে, কতক আদিম আচার অবলম্বন করিয়া আছে, কতক হিন্দুদের নানা উপশাখার আচার্য্যদের কাছ হইতে দীক্ষা নিয়া নিজেদের মধ্যে নিদারুণ সামাজিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীবিছরা চাহেন যে, সাঁওতালরা উচ্চবর্ণের সমান সম্মানের ও মর্য্যাদার অধিকারী হউক। একদা ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চা-বাগানের শ্রমিক রূপে এদেশে আসিয়াছিলেন, এখন ইঁহারা নির্ব্বিশেষে কৃষিজীবী। শূকর-মুরগী পালন ইহাদের স্বভাবজাত জীবিকা।

আমি বলিলাম,—স্বজাতিকে শিক্ষা দাও, জ্ঞান দাও, জ্ঞানের মত শক্তি নাই।

কিন্তু কে কাহাকে জ্ঞান দিবে? স্কুল খোলা হইয়াছে, ছাত্র নাই। আশঙ্কা, পড়াশুনা করিলে কার ছেলে আর লাঙ্গল ঠেলিবে?

বলিলাম,—জ্ঞান অর্জ্জিত হইলে সাধারণ চাষা ভাল চাষা হইবে, তাহার জ্ঞান তাহাকে অল্প শ্রমে বেশী উৎপাদনের সুযোগ দিবে, জ্ঞান-বলে সে বৃহত্তর বাধাকে ক্ষুদ্রতর আয়াসে দমন করিবে।

হয়ত আগামীতে আমাদিগকে এই সব সাঁওতালদের বস্তিতে বস্তিতে যাইয়া আদর্শের বাণী প্রচার করিতে হইবে কিন্তু ইহাদের নিজেদের মধ্যে জাগিবে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তবে না!

তোমাদেরও কাজ কম নহে। যেখানে একাকী আমি বা একাকিনী

সাধনা যাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, সেখানে যোগ্যতা স্বল্পতরা হইলেও, তোমাদের কি দলে দলে ছুটিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই? সব কাজ আমরাই দুই জনে করিয়া ফেলিব, তোমরা কি কোনও কাজেই ঘাড় পাতিবে না? আমাদের এই অবিশ্রাম ছুটাছুটি দেখিয়া তোমাদের একটু আধটু ছুটাছুটি করিতে সখও জাগে না? অবিরাম আমরা ছুটাছুটি করিতেছি, আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের কোনও পরোয়া না রাখিয়া, প্রাতে ন'টা সোয়া ন'টায় আলিপুরদুয়ার জংশন ছাড়িয়াছি আর এই পত্র লিখিতেছি রাত্রি একটায় বসিয়া। এই সময়টুকুর মধ্যে একটুখানি বিশ্রাম পাইবার ফাঁক হয় নাই। তবু সানন্দে সাহ্লাদে সপ্রেমে কাজ করিয়া যাইতেছি। এই সঙ্গে সঙ্গে ইহা কি আশা করিব না যে, তোমরাও প্রতি জনে কাজে হাত দাও? স্কুলমাষ্টারী, দোকানদারী, ডাক্তারী বা অফিসের কেরাণীগিরি বজায় রাখিয়াও প্রত্যেকটী মানুষ দৈনিক কিছু না কিছু সমাজ-কল্যাণ-মূলক কাজ করিতে পারে, ইতস্ততবিক্ষিপ্ত নানা জাতির, নানা বর্ণের, নানা প্রকৃতির নরনারীদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৈতিক ও আত্মিক উজ্জীবনের বার্ত্তা শুনাইতে পারে, প্রত্যহ একই পুণ্য বার্ত্তা শুনাইতে শুনাইতে চিরকালের অন্ধ-কুসংস্কার সমূহ বিদূরিত করিয়া জগতের কোটি কোটি মানবাত্মাকে আত্মোদ্ধারের দুশ্চর তপস্যার এবং জগদুদ্ধারের দুশ্চরতর সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারে। তবে কেন তোমরা এখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, বল! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরি-ওঁ আলিপুরদুয়ার জংশন

২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র আমাকে ব্যথিত করে নাই, চিন্তিত করিয়াছে। তুমি জোর করিয়া টান দিয়াছ আমার বিশ্বাস-তরুর মূলকে। এই তরু শূন্যে গজায় নাই, ভূমিতেই জন্মিয়াছে, ভূমিতেই বাড়িয়াছে এবং ভূমিতেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে বর্দ্ধিততর আয়তন পাইতেছে। তোমরা দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাও না, যতটুকু কাছে আসিলে আমাকে দেখা যায় আমাকে বুঝা যায়, ততটুকু কাছেও আসিতে চাহ না। তাই ভাবিতেছ, আমি শূন্যে বীজ বপন করিয়াছি এবং তাহার ফলে অঙ্কুরিত হইতেছে কেবল আকাশ-কুসুম।

এই পর্য্যন্ত বেশ সহ্য করা যায় কিন্তু দূর হইতে কিছু না দেখিয়া বা কিছু না জানিয়াই তোমরা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলে যে, অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করার দরুণ আমি আমার জন-সেবার সামর্থ্যকে সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছি, আমার অযাচক-বৃত্তির জন্যই তোমাদের সঙ্ঘ দশটা কলেজ, বিশটা স্কুল, পঞ্চাশটা ছাত্রাবাস তৈরী করিতে পারিল না আর এই জন্যই অমুক সঙ্ঘের চেয়ে তোমাদের সঙ্ঘের সম্মান কম, তমুক আশ্রমের চেয়ে তোমাদের আশ্রমের টাকা কম, তমুক মঠের চেয়ে তোমাদের মঠের সুখ্যাতি, প্রতিপত্তি ও জন-

প্রভাব কম। কি যে অদ্ভূত তোমাদের এই যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত, তাহা ভাবিতেও অবাক্ লাগে! একবার ত' বাবা ভাবিয়া দেখিলে না যে, অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন করাতে আমি গৃহস্থ-সাধারণের নিকটে কত বড় অভয়ের বস্তু হইয়াছি। আমার ভাষণ শুনিতে দশ, বিশ, পঁচিশ হাজার লোক জড় হয় কিন্তু একটা লোকের মনে এই শঙ্কা জাগে না যে, এমন চমৎকার বক্তৃতা দিবার পরের দিনই প্রাতে আমি বা আমার লোকেরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে চাঁদার খাতা লইয়া তহশিল আদায় সুরু করিয়া দিব। অহঙ্কার করিতে চাহি না, কারণ সবই ত' ভগবদিচ্ছায় করিতেছি, নিজের কোনও কৃতিত্বের দরুণ নহে, তবু বলিতে চাহি, জনসমাজের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং কাহাকেও ভিক্ষা-প্রার্থনা দ্বারা বিরক্ত করেন নাই, এইরূপ একটা দৃষ্টান্তেরও কি বর্ত্তমান ভারতে প্রয়োজন ছিল না?

তুমি ভাবিয়া বসিয়াছ, চাঁদার খাতা নিয়া লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিলেই আবশ্যকীয় অর্থ আসিয়া যাইবে। কিন্তু তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ নাই যে, চাঁদা আদায় করিতে গেলে মানুষকে নিজের নিকটে নিজেই কত হীন হইতে হয়। যার বেশী টাকা আছে, সেই বেশী চাঁদা দিবে, আশা করা যায়। সুতরাং চাঁদাপ্রার্থীরা ধনী লোককেই গিয়া বেশী উৎসাহ করিয়া ধরিবে। ধনীর পিছনে ইহারা অধিক ঘুরিবে, দরিদ্রকে অবজ্ঞা করিবে, ধনীকে ইহারা বেশী খাতির করিবে, তোয়াজ করিবে, খোশামোদ করিবে, গরীবদিগকে অল্প খাতির দিবে,—ইহা ত' কার্য্যক্ষেত্রে আপনা আপনি আসিয়া যাইবে। কিন্তু এই জাতীয় বৈষম্য

কি আমার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, না, আমাতে শোভা পায়?

তোমরা আমার কাছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান চাহিতেছ। কিন্তু তোমরা লক্ষ্য কর নাই যে, প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বড় জিনিষ আমি জনসমাজের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। বুকে প্লুরিসির প্রলেপ বাঁধিয়া জ্বরগ্রস্ত রুগ্ন শরীর নিয়া আমি বর্দ্ধমান হইতে শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর হইতে খুলনা ভ্রমণ করিয়া ভাষণ দিয়া মানুষের কাছে আত্মচেতনার বাণী পরিবেশন করিয়াছি কিন্তু প্রতিদানে কাহারও কাছে পাথেয় পর্য্যন্ত দাবী করি নাই। এখনো আমি দেশের পর দেশ পর্য্যটন করিয়া মানুষকে কেবল এই বাণীই শুনাইতেছি যে, মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষ দেবতার চেয়েও উত্তম, মানুষকে মানুষ হইতে হইবে, পরম-প্রেমভরে মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। আহার, বিশ্রাম, লাভ প্রভৃতি কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া এই কাজ আমি অফুরন্ত উদ্যমে করিয়া যাইতেছি। আমি জগৎকে কোনও প্রতিষ্ঠান দিয়া যাইতে না পারিলে জগতের মানুষ আমাকে ধিক্কার দিবে না। কেন তোমরা ধাতুদৌর্ব্বল্য-রোগীদের মত কেবল মনঃকল্পিত হীনতায় ও হীনমন্যতায় নিজেদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছ?

আমার অবর্ত্তমানে আমার সঙ্ঘ থাকিবে কিনা, তাহা নিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার তোমার কি প্রয়োজন ঘটিল, তাহা কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। পৃথিবীর অনেক মহৎ ব্যক্তিরই অবর্ত্তমানে তাঁহাদের গড়া মঠ, মন্দির, আশ্রম, সঙ্ঘ এবং প্রতিষ্ঠান ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের মহত্ত্ব কিছু মাত্র কমে নাই। আমি

সামান্য মানুষ, আমার অবর্ত্তমানে আমার সঙ্ঘ বিদ্যমান না থাকিলে তাহা নূতন করিয়া একটা আফশোষের বিষয় হইতে পারে না। আর, ইহাও অতি চমৎকার মনোবৃত্তি যে, তোমরা নিজেদিগকে আমার সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে কর এবং ইহাই প্রত্যশা কর যে, তোমরা নিজ নিজ সংসার-সেবায় নিজ নিজ স্বার্থের পথানুসরণে জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত এবং পার্থিব সম্পদের প্রত্যেকটী কণা ব্যয়িত করিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া কেবল অলস প্রত্যাশাই করিবে যে, সঙ্ঘের বিস্তৃতি, বিকাশ ও স্থায়িত্বের জন্য যত কিছু করিবার, সব আমিই করিয়া যাইব।

এই মূঢ়তা তোমাদের কত দিনে দূর হইবে?

আমার সহিত তোমাদের সম্পর্ক ত' একটা অতি মহান্ সঙ্কল্পকে লইয়া। জগন্মঙ্গলের জন্য তোমরা দেহ, মন, প্রাণ দিবে, নিয়ত জগৎ-কল্যাণের জন্য হইতে থাকিবে তৈরী, জগদ্বাসীর স্বার্থের সহিত নিজেদের স্বার্থকে নিয়ত জ্ঞান করিবে অভিন্ন, এই প্রতিজ্ঞা ত' দীক্ষার ঘরে বসিয়া করিয়াছিলে। পৃথিবীর কোনও গুরু নিজ শিষ্যদিগকে যেমন সঙ্কল্পে আরূঢ় করিতে চেষ্টা করেন নাই, তেমন সঙ্কল্প লইয়া তোমাদের দীক্ষার ঘরে হইয়াছিল প্রথম সম্পর্ক। কেন তোমরা এই জেদ করিবে যে, তোমাদের গুরুদেব তাঁহার অযাচক-বৃত্তি পরিহার করিয়া চাঁদার খাতা লইয়া নামুন? তাহার আগে তোমাদের ভিটামাটি সব কেন বিক্রীত হয় নাই, তাহার আগে তোমাদের গৃহের রাজৈশ্বর্য্য

কেন বাজারে পাঠান হয় নাই, তাহার আগে কেন তোমাদের সর্ব্বস্বের বিনিময়ে যে বিপুল অর্থ মিলিতে পারে, তাহা তোমাদের নিজের সঙ্ঘের নানা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হইবার জন্য আসে নাই? এই সঙ্ঘ ত' কেবল আমারই নহে! এই সঙ্ঘের তোমরা কি কিছুই নহ? তোমরা না থাকিলে এই সঙ্ঘের অস্তিত্ব কি করিয়া থাকিতে পারে? নিজের সঙ্ঘের জন্য তোমাদের দান, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সহযোগ কেন নাই?

সাম্প্রতিক একটা দৃষ্টান্ত দেই। মানভূমে পুনরায় দুর্ভিক্ষ চলিয়াছে, এ সংবাদ তোমরা জান। আশ্রম হইতে সাধ্যমত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের অন্ন সরবরাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও অর্থব্যয় চলিতেছে। কিন্তু তোমরা কেহই সহযোগ করিবার রুচি আপনা আপনি কেন পাও নাই? সঙ্ঘের কৌলীন্য বাড়াইতে হইবে, এই জিদ তোমাদের পূরাই আছে কিন্তু নিজেদের করণীয় কর্ত্তব্য যে কি, এই বিষয়ে চিন্তাশক্তিকে পরিচালনা করিতে রুচির এত দৈন্য কেন?

তোমাদের অন্তরের দারিদ্র্য এত অধিক যে, নিজেদের অযোগ্যতাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য গুরুদেবের উপরে চাপ দিতেছ যে, তিনি যেন অবিলম্বে নিজ অযাচক-বৃত্তি পরিহার করিয়া চাঁদার খাতা নিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি বহন করিয়া দশ বিশটা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও ছাত্র-ভবন তৈরী করিয়া দিয়া যান। গুরুদেবের শরীরটার এখন বয়স হইতেছে, এখনই যদি তিনি এই কার্য্যে অবতীর্ণ

না হন, তাহা হইলে জন-সমাজে যে তোমাদের আর ইজ্জৎ বাঁচে না! গুরুদেব হঠাৎ কায়া পরিত্যাগ করিলে তোমাদের দ্বারা যে এসব মহৎ কার্য্য সম্পাদন সম্ভব হইবে না! তোমরা লোকসমাজে যশ চাহ, প্রতিপত্তি চাহ এবং তাহা চাহ কোনও এক দধীচীর অস্থিদানের ফলস্বরূপ। তোমরা নিজেরা কেহ কিছু করিতে চাহ না।

তোমার একটী ধনী গুরুভ্রাতার জীবনের কাহিনী বলিব? তাহা শুনিতে কি রুচি বোধ করিবে? লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁহার উপার্জ্জন হইতেছে আর আজ রেডক্রস সোসাইটিকে, কাল যক্ষ্মা হাসপাতালকে, পরশু অমুক মঠে, তরশু তমুক মন্দিরে দান হইতেছে। এক বৎসরে এই দানবীর আড়াই লক্ষ টাকা দান করিলেন। বড় বড় দান করেন আর গুরুদেবের কাছে আসিয়া গল্প করেন, আজ অমুককে দিলাম বিশ হাজার, তমুককে দিলাম ত্রিশ হাজার। গুরুদেব বলেন,—বেশ করিয়াছ, জগতের যেখানে যে সৎকাজে দান কর, সবই আমার কাজ। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা। মহাদাতার দারিদ্র্য আসিল। শিষ্য তখন একদিন গুরুদেবকে বলিলেন,—বাবা, আপনার টাকা দরকার, ইহা ত' জানিতাম না, জানিলে তখন কত দিতে পারিতাম। আজ যে আমার কিছুই নাই। গুরুদেব বলিলেন,—আমার টাকার দরকার, একথা আমি তোমাকে জানাইতে যাইব? তোমার কাছে হাত পাতিতে গেলে আমি লঘু হইয়া যাইতাম না? আমি গুরুই থাকিতে চাহি, কখনো লঘু হইব না।

উপরে বর্ণিত তোমাদের এই গুরুভ্রাতাটীর ন্যায় তোমরা প্রায় সকলেই মানের লোভে, যশের লোভে, প্রতিপত্তি লাভের লোভে, দশ জনের কাছে নিজের সম্মান অটুট রাখিবার প্রয়োজনবোধে অনেক দান করিয়া থাক। তোমাদের সেই দানহস্ত তোমাদের নিজের সঙ্ঘের জন্য উদার ভাবে প্রসারিত হইতে দেখা যায় নাই। এখানে দান করিলে মান, যশ, প্রতিপত্তি, অতিরিক্ত অবৈধ খাতির এবং তোয়াজ তোমরা প্রত্যাশা করিতে পার না। এই জন্যই কি বাবা তোমরা অযাচিত করুণায় বিগলিত হইয়া অযাচক গুরুদেবকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া রাস্তায় নামিতে পরামর্শ দিতেছ? কিন্তু জানিয়া রাখ, এই কার্য্য তোমার গুরুদেবের দ্বারা সম্ভব হইবে না। আমি ভিক্ষা করিয়া টাকা তুলিতে কখনও নামিব না। কিন্তু হঠাৎ পরমায়ু-ক্ষয় না হইয়া গেলে আমি বিনা ভিক্ষাতেই একটা শক্ত প্রতিষ্ঠান সম্ভবতঃ গড়িয়া দিয়া যাইব।

বাছা হে, শিষ্য হইয়াছিলে ভগবৎ-সাধনা করিবার জন্য। গুরুদেব তোমার সহিত কোনও আর্থিক চুক্তি করেন নাই। আমার মতন গুরুরা শিষ্যের বিত্তের প্রত্যাশাও করেন না। গুরুদেবের সঙ্ঘ তোমাদেরই সঙ্ঘ, ইহা জানিয়াও তোমাদের ভিতরে এই বিষয়ে কোনও জাগ্রত চেতনা স্ফুরিত হয় নাই। নিজেদের এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাবকে বিবেকের নিকট ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই তোমরা গুরুদেবের অযাচকত্বকে হেয় জ্ঞান করিতেছ। আমি বলি কি, তোমরা নিজ নিজ

ঈশ্বর-সাধনে ভাল করিয়া মন দাও। জগতে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান কতই হইতেছে। সবই সাময়িক। সেই সকল সাময়িক ব্যাপারে সময়োচিত ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিজ পুরুষ-সিংহত্ব প্রমাণিত করিবার রুচি, সাহস বা চেষ্টা যাহাদের নাই, তাহারা বরং এই সকল চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া মনটা দিয়া প্রাণটা ভরিয়া ভগবানের নামের সাধনই করিতে থাকুক। ইহার ফলে তাহাদের সর্ব্বকুশল লাভ হউক। ইহার ফলে তাহাদের দ্বারা জগতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মঙ্গল সাধিত হউক।

তুমি যে সাহস করিয়া আমাকে অরুচিপ্রদ পত্র একখানা দিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে নিশ্চয়ই প্রশংসা করিব। কিন্তু অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা মানুষকে আমি বেশী ভালবাসিয়াছি। জগতের একটা মানুষের প্রতিও যদি আমার প্রেম শাশ্বত ও সুন্দর হইয়া থাকে, তবে তাহার দাম একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কৃতিত্ব অপেক্ষা কম হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরি-ওঁ

মাদারীহাট (জলপাইগুড়ি)

২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একুশে ভাদ্র, ফকিরাগ্রাম যাইবার আগের দিন, আলিপুরদুয়ার জংশনে যে জনসভা হয়, তাহাতে জনতা কম পক্ষে দশ হাজার হইয়াছিল। জনতার আধিক্য এই দিনকার সভার প্রধান কৌলীন্য নহে, এই দিন কল্যাণীয়া সাধনা আমার অযাচক-বৃত্তি সম্পর্কেই নাকি প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বলিয়াছিল। সেই বক্তৃতার বিষয়-বস্তু নিয়া ঐ অঞ্চলে এত আলোড়ন হইয়াছে যে, তৎসম্পর্কে দুই একটু মন্তব্য তোমাকে না শুনাইয়া পারিলাম না। আমি আমার দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ সমাপ্ত করিয়া আগেই বিশ্রাম-স্থানে চলিয়া আসিয়াছিলাম এবং শতাধিক পত্রের উত্তর-দান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। ঐদিন সাধনা মন্ত্রমুগ্ধ জনতার সমক্ষে মোট তিন ঘণ্টা ভাষণ দেয়।

কর্ম্মযোগীদের অযাচক-বৃত্তি গ্রহণের দৃষ্টান্তে অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা লোকের কাছে চাঁদা তুলিয়া সৎ-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া থাকেন বা গড়িবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নাকি অভিমত এই যে, একটা লোক হঠাৎ আসিয়া একটা অযাচক আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিয়া অনেক প্রতিষ্ঠানের ভাত মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইঁহাদের যুক্তি এই যে, অযাচক আশ্রম নিজেও চাঁদা তুলিবে না, অপরেরও চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়া দিবে,—ইহা হইতেছে dog in the manger policy. এক কুকুর এক ঘোড়ার আস্তাবলে ঢুকিয়া ঘোড়ার দানা খাইবার পাত্রে বসিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। কুকুর কখনো ঘোড়ার দানা খায় না, সুতরাং ঐখানে বসিয়া থাকার তাহার কোনও সার্থকতা নাই কিন্তু ঘোড়া তাহার খাদ্য খাইতে

আসিলে সে ঘেউ ঘেউ করিয়া ঘোড়াকে দূরে সরিতে বাধ্য করিবেই। একশ্রেণীর লোকের এই ধারণা হইয়াছে যে অযাচক আশ্রম এভাবে অন্যান্য আশ্রমের রুটি মারিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কয়েকটা সঙ্ঘের অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী অনেকগুলি লোক সমগ্র জেলাটার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়া আমাদের ধর্ম্মপ্রচার অভিযানের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। একমাত্র কুচবিহার সহর ব্যতীত আর প্রতিটি স্থানে আমরা এই বিরুদ্ধ প্রচারের প্রত্যক্ষ ফল স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। অতএব আলিপুরদুয়ার জংশনের সভাতে সাধনাকে আমাদের অযাচক-বৃত্তি সম্পর্কে বাধ্য হইয়াই কিছু বলিতে হইয়াছিল।

আমরা ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য দেশ-পর্য্যটন করি। কাহারও কাছে পাথেয় দাবী করি না, কাহারও নিকট পারিশ্রমিক নেই না। সভাস্থলে দাঁড়াইয়া অযাচক-বৃত্তির বিষয়েও প্রচারকার্য্য করি না। আমরা বলি, মানুষ—সকলে প্রকৃত মানুষ হও। অতীতে যত বড় বড় মানুষ আজ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের তুল্যকক্ষ বা তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্তর মানুষকে প্রসব করিবার মত শক্তি ভারত-মাতার এখনও আছে। তোমাদের মধ্য হইতে সেই সকল অসামান্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটুক। তপস্যার দ্বারা সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়, তোমরা তপস্বী হও, ভগবৎসাধনে ব্রতী হও। ভগবান্‌কে লাভ করিবার হাজার হাজার পথ আছে, যে যেই পথে রুচি বোধ কর, সে সেই পথেই অগ্রসর হও। পথ যে জন পাইয়াছ, কাহারও

প্রলোভন-ভাষণেই সে নিজের পথ ছাড়িও না। জমি বন্দোবস্ত নেওয়াটাই বড় কথা নয়, জমি নিবার পরে তাহাতে আবাদ করা চাই। তোমরা নিজ নিজ পছন্দমতন জমি নিবার পরে সেই জমিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাক সোণার ফসল ফলাইবার জন্য।

ইহাতে যদি কাহারও স্বার্থহানি ঘটিয়া যায়, তবে তাহার আমরা কি করিতে পারি? মানুষকে ভালবাসিয়া মানুষের প্রয়োজনীয় কথা তাহাদের নিকটে পরিবেশন করিতেছি। কাহাকেও বলিতেছি না যে আমাদের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। কাহাকেও বলিতেছি না যে, অন্যান্য পথ সব ভ্রান্ত ও নরকপ্রদ। ইহাতেও যদি সাম্প্রদায়িক ঈর্য্যার কুৎসিত মূর্ত্তি গৃহে গৃহে গিয়া দন্তপংক্তি বিকাশ করে, তবে তাহাকে আমল না দিয়া আগ্রাহ্য করাই উচিত। আমরা তাহাই করিতেছি এবং তাহা করিতেছি বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধকারীদের প্রতি প্রেমবশতঃ, বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরি-ওঁ মালবাজার (জলপাইগুড়ি)

২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা চারিদিকে খুব ভাল কাজ করিয়াছ। তাহা আমি অনুভব

করিয়াছি। হরিনাম-কীর্ত্তনের মধুর ঝঙ্কারে তোমরা অনেক স্থানের অনেক প্রাণে আনন্দের গুঞ্জন তুলিয়াছ। কিন্তু তোমরা স্থায়ী কোনও উচ্চভাবের প্রেরণা তাঁহাদের মনে রাখিয়া আসিতে পার নাই। এই কাজটী তোমাদের অসমাপ্ত রহিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে একটী পেরেক পুতিতে হইলে যেমন পর পর বহুবার হাতুড়ির মৃদুমন্দ চোট দিতে হয়, মানুষের মনে উচ্চভাবকে স্থায়ী করিবার কাজটাও কতকটা সেইরূপ। একই জাতীয় কথা, আলোচনা এবং গ্রন্থ বারংবার শুনাইতে হয়। তোমরা এই কার্য্যটী এখনও কর নাই।

দল বাড়ানো দোষের কথা নহে, যদি অবশ্য বাড়ে সৎলোকের দল। তবু আমি তোমাদিগকে দল বাড়ানোর চেষ্টা হইতে সযত্নে সুদূরে থাকিতে বলিয়া আসিতেছি। এই বলা আমার কোনও বাহ্য pose বা অভিনয় নহে, এই বলা আমার অন্তরের অভিপ্রায়ের প্রকট প্রকাশ। দল বাড়াইবার চেষ্টার ভিতরে যে সকল আপোষ রহিয়াছে, তাহাকে আমি সৎকর্ম্মের ভিত্তি-বিদারক বলিয়া মনে করি।

কিন্তু আদর্শ-প্রচারে তোমাদের কার্পণ্য, কুণ্ঠা বা দ্বিধা থাকিতে পারে না। উচ্চভাব সমূহ প্রচারিত না হইলে সাধারণ বা অজ্ঞ লোকেরা তাহার সহিত পরিচিত হইবেন কি করিয়া? এই জন্যই আদর্শ-প্রচারের প্রয়োজন আছে। তোমরা সেই কাজটী অমিতবিক্রমে করিবে, তাহা আমি চাহি। যতকাল আমার শরীর কর্ম্মক্ষম আছে, ততকাল আমি ত' এ কাজে দৈনিক আঠারো ঘণ্টা সময় ব্যয় করিবই কিন্তু আমার পরিশ্রমটুকুকেই তোমরা পরম সম্বল করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিও না। তোমরাও সহস্র সহস্র বাহু বিস্তার

করিয়া কাজে লাগিয়া যাইবে, ইহাই আমি চাহি। কতকাল ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি, তোমরা আমার বাহু হও।

আমার কণ্ঠ যতকাল সম্ভব, কথা কহিবে। আমার লেখনী যতকাল সম্ভব লিখিয়া চলিবে। ভাষণে বা লিখনে আমি কুণ্ঠা করিয়া শ্রম করিব না, এ যাবৎ করিও নাই। কিন্তু তাহারই স্মৃতিকে অক্ষয় কবচ রূপে বক্ষে ধারণ করিয়া তোমরা কেবল মাদুলী ধুইয়া জল খাইবে, ইহা আমি হইতে দিতে চাহি না। তোমাদের কণ্ঠ, তোমাদের লেখনী কেন স্তব্ধ হইয়া থাকিবে? তাহারাও পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে সমান উৎসাহে অগ্রসর হউক।

তোমাদের যখন ডাকিয়াছি, প্রেমভরেই ডাকিয়াছি। আমার রুক্ষ্ম-বচন ও শাসন-বাক্য প্রেম লইয়াই নির্গত হইয়াছে। তোমরা কি আমার অন্তরের সেই সুগভীর প্রেমের স্পর্শ নিজ নিজ অন্তরে কখনো কখনো পাইতেছ না?

ভাল করিয়া কাজে লাগ। যতটুকু করিয়াছ, তাহার প্রশংসা করিব কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। আরও করিতে হইবে। এমন অনেক পুরাতন কথা আমি কহিয়াছি, যাহা এখনও কোটি কোটি মানবের কাছে নূতন। তাহাদের নিকটে এই শাশ্বত সত্যগুলি পরিবেশন করিতে কেন তোমরা অকুতোভয় হইবে না? কেন তোমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে না?

কাজ কিন্তু আমার নয়, কাজ তোমাদেরই। তোমাদেরই কাজ তোমরা করিবে। শুধু অহঙ্কারকে বলি দিবার কৌশল রূপে জানিয়া নিবে কাজ আমার, কাজের ফল আমার, কাজের তৃপ্তি, আত্মপ্রসাদ

ও গৌরব সবই আমার। তোমারই কাজ তুমি আমার কাজ বলিয়া করিবে। ইহাতে কর্ম্মের অনাসক্তি ও নিষ্কলঙ্ক ভাব অটুট থাকিবে।

তোমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছি। স্বাস্থ্যের দিকে তীব্র নজর রাখিবে আর সংসারের সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেখান দিয়া যেমন করিয়া পার, জনসাধারণের মধ্যে সদ্‌ভাব প্রচারের কাজ করিয়া যাইবে। কয়েকটা ধর্ম্মসঙ্ঘ নিজেদের প্রতিপত্তি-লোপ বা ক্ষেত্র-সঙ্কোচের আশঙ্কা করিয়া নিজেদের শিষ্যদের দ্বারা যে সকল জঘন্য বিরুদ্ধতা করিয়া যাইতেছেন, তাহা তাঁহাদের উপযুক্ত হইতেছে না বলিয়া জনসাধারণ একদিন নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের অপবাদ ও মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য শক্তিক্ষয় না করিয়া তোমরা দ্বেষহীন চিত্তে কেবল ভাব-প্রচার করিয়া যাইতে থাক।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আমার কিন্তু অবাক্ লাগিয়াছে যে, যেই উচ্চস্তরের ভদ্রলোকদের আগ্রহেই তোমাদের কলোনিতে আমার ভ্রমণ-তালিকা করিয়াছিলে, আমার মনে হইল, তোমাদের যোগ্য চেষ্টার অভাবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের অন্তরের ভাবগুলির সঙ্গে পরিচিত হন নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছায় আসিয়া আগ বাড়াইয়া আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচয় স্থাপন করিবেন, তোমরা হয়ত ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলে। এরূপ ঘটনা কখনো কখনো যে না ঘটে, তাহা নহে। কিন্তু এরূপ প্রত্যাশা করা তোমাদের পক্ষে ভুল হইয়াছে। চাঁদা-সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানগুলির কোনও কোনও কর্ম্মীকে এই কথা বলিতে শুনা গিয়াছে,—"আমরা যে লোকের বাড়ীতে চাঁদা

তুলিতে যাই, তাহার কারণ এই যে, আমরা লোকের ঘরে বসিয়া আমাদের আদর্শের কথা শুনাইয়া আসি।" বৌদ্ধ শ্রমণেরা গৃহস্থের গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন এবং আহারান্তে গৃহস্থকে ধর্ম্মদেশনা দ্বারা জ্ঞানধনে ধনী করিয়া নিজ নিজ বিহারে ফিরিতেন। তোমরা লোকের নিকটে চাঁদা তোল না বলিয়াই যে তাঁহাদের গৃহে গিয়া অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া শুনাইতে পারিবে না, এ কথা কে বলিল? তোমাদিগকে চাঁদা-সংগ্রহে নিষেধ করিয়াছি বলিয়াই কেন তোমরা ধরিয়া নিবে যে, তোমাদের ভাব ও আদর্শ যেই সকল গ্রন্থে গ্রথিত হইয়া আছে, তাহা পড়িয়া পড়িয়া শুনাইবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় গৃহে গৃহে যাইবারও বারণ আছে?

পাকিস্তান-নারায়ণগঞ্জ হইতে তোমার এক বিভ্রান্ত ভ্রাতা আমাকে এক লম্বা পত্র দিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই যে, তোমাদের উৎসব-সমূহ উপলক্ষে তোমরা যে জন-সাধারণের গৃহে গৃহে চাঁদা তুলিবার জন্য যাও না, ইহা দ্বারা তোমাদের প্রতিষ্ঠানের গণ-সংযোগ ও জন-মানসের সহিত অন্তরঙ্গতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে। তাঁহার মত এই যে, তোমরা লোকের বাড়ীতে চাঁদা তুলিবার জন্য যাও না বলিয়া লোকেরা তোমাদের উৎসব-সমূহকে তাঁহাদের নিজেদের উৎসব বলিয়া মনে করেন না, তোমাদের উৎসবের বৈফল্যকে নিজেদের বৈফল্য ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হন না, তোমাদের উৎসবের সাফল্যকে নিজেদের সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া আনন্দে দীপ্ত হন না। এই যুক্তিতে ভর করিয়া তিনি আমাকে বলিতেছেন যে, আমার কর্ত্তব্য আমার সকল শিষ্যদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া যে, অমুক সঙ্ঘ, তমুক

মঠ ও তমুক আশ্রম যেমন করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ উৎসবসমূহের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ঘরে ঘরে, ট্রেণে-ষ্টীমারে, পথে-ঘাটে চাঁদা তুলিয়া থাকেন, তোমাদের উৎসবাদিতেও তাহা করা হউক। তাঁহার মতে, ইহার মুখ্য শুভফল এই হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি জানিতে বাধ্য হইবেন যে, কোন্ আশ্রমের উৎসব হইতেছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে জন-সাধারণ আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কেও কতকটা পরিচয় লাভ করিবেন।

যুক্তিগুলি তোমাদের পছন্দ হইয়াছে কিনা, তোমরা ভাবিয়া দেখ। আমার কিন্তু পছন্দ হয় নাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ হইবে ভাব দিয়া, চাঁদা দেওয়া-নেওয়া দিয়া নহে। ঘরে ঘরে গিয়া তোমরা ভাব প্রচার করিতেছ কি? হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্ব্বত্র তোমরা তোমাদের আদর্শের বাণী কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করাইতে যত্ন নিয়াছ কি? তাহারই নাম জন-সংযোগ বা গণ-সংযোগ। ভাব দেওয়া আর ভাব নেওয়ার নাম সংযোগ। চাঁদা দেওয়া আর চাঁদা নেওয়ার নাম সংযোগ নহে। আমার নিজের পরিচালনে আমাদের প্রতিষ্ঠানের যে কয়টা উৎসব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে হইয়াছে, বিশালতায় তাহার প্রায় প্রত্যেকটাই ঐতিহাসিক কিন্তু তাহার একটাতেও জন-সাধারণের কাছে চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও চেষ্টা হয় নাই কিন্তু বিপুল গণ-সংযোগ হইয়াছে। গণ-সংযোগ কথাটার মানে হইতেছে ভাবের মাধ্যমে জনগণের সহিত অন্তরঙ্গতা। চাঁদার মাধ্যমেই তাহা হইতে হইবে, ইহা নহে।

তোমাদিগকে গণ-সংযোগ করিতেই আমি বলিতেছি। এই কাজটায়

তোমাদের বড়ই ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। তোমরা লোকের কাছে চাঁদা তুলিতে যাও না বলিয়া গণ-সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এমন কথা ভাবিবার দরকার নাই। বল, খ্রীষ্টান মিশনরীরা কাহার বাড়ীতে চাঁদা তুলিতে যান? আমরা আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি, পুরুষ এবং মহিলা পাদ্রীরা ঘরে ঘরে গিয়া বাইবেল পড়িয়া শুনাইতেছেন। আমাদের যৌবনে দেখিয়াছি, রামকৃষ্ণ-ভক্তেরা তাঁহাদের মিশনের প্রকাশিত ধর্ম্মগ্রন্থগুলি হোষ্টেলে হোষ্টেলে ঢুকিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি নিজেও নিজের রচিত গ্রন্থ হাতে করিয়া চট্টগ্রাম, ঢাকা ও কলিকাতার রাজপথে বিক্রয় করিয়াছি।—ইহার নাম গণ-সংযোগ।

বছরের পর বছর আমি কত পল্লী, কত নগর ঘুরিয়াছি। চাঁদা তুলি না, তাই পাথেয় নির্ব্বাহ করিয়াছি আমার রচিত বহি বিক্রী করিয়া। নিজের পয়সায় সভার বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াছি, নিজের পয়সায় দেওয়ালে পোষ্টার মারাইয়াছি, নিজের পয়সায় সভার সতরঞ্জি, ত্রিপাল ভাড়া নিয়াছি, নিজের পয়সায় হল ভাড়া মিটাইয়াছি,— এভাবে আমি কাজ করিয়াছি। বারো বছরে এক যুগ হয়। তিন যুগের অধিক এভাবে চলিয়াছে। ইহাতে যাহা হইয়াছে, তাহার নাম গণ-সংযোগ। পরশু মাদারীহাট আসিলাম, দেখিলাম সেখানকার এক প্রভাবশালী পুরুষ তেইশ বছর আগে আমাকে উলিপুরে (রংপুর) ভাষণ দিতে শুনিয়াছেন এবং তাহারই প্রভাবে এখন মাদারীহাটে প্রাণান্ত যত্ন নিয়া অনুষ্ঠান সফল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কাল মাল-বাজার আসিলাম, আজ দেখিতেছি আমার ভাষণ ঢাকা, রংপুর,

কুমিল্লা, চাঁদপুরে বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ বছর আগে শুনিয়াছেন, এমন সজ্জন এখানে অনেক আছেন এবং আমার সেই দিনকার বাণী এখনো ইঁহাদের কাণে বাজিতেছে।—ইহারই নাম গণ-সংযোগ।

ভিক্ষা না করিয়া, চাঁদা না তুলিয়া আমি একাকী যাহা করিয়া আসিতে পারিয়াছি, তোমরা সকলে মিলিত হইয়াও তাহা কেন করিতে পারিবে না? দশে মিলিয়া কাজ করিলে প্রতি জনের স্বল্প ত্যাগ ও স্বল্প আয়াসে অনেক অভাবনীয় এবং বিরাট কাজ হইতে পারে না কি? তোমরা ক্ষুদ্রের শক্তিকে কেন বিশ্বাস কর না? কেন তোমরা শত সহস্র ক্ষুদ্রকে একত্র মিলাইয়া এক মহা-বৃহতের সম্ভাবনাকে অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা কর না? শ্রদ্ধা হইতে জ্ঞান আসে, জ্ঞান হইতে আসে শক্তি আর শক্তি দেয় পুরুষকার, পুরুষকার-প্রয়োগে আসে সিদ্ধি। তোমরা শ্রদ্ধাবান্ হও।

প্রেমিকের আসে শ্রদ্ধা, তোমরা প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরি-ওঁ

মালবাজার

২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ইচ্ছুক কর্ম্মী, স্বেচ্ছায় অকাতরে নিঃস্বার্থ সেবা দিতে চাহে, তাহাকেও যদি কাজে না আনা যায়, তাহা হইলে কর্ম্মপরিচালকদের

যোগ্যতার বা বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করা যায় না। সর্ব্বত্র কর্ম্মীর অভাব। এমতাবস্থায় কর্ম্মী পাইয়াও তাহাকে কাজে না লাগান খুব বড় রকমের বেহিসাবী ব্যাপার। শ্রীমান র—কাজ করিবার যোগ্যতা রাখে না, তাহা ত' নহে।

আর এক কথা। কর্ম্মী রূপে যাহাদের বিশেষ কোনও যোগ্যতা নাই, তাহাদেরও যদি কাজের আগ্রহ দেখিতে পাও, তাহা হইলে ছোট-খাট কাজ তাহাদের হাতে দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এভাবে অনেক তুচ্ছ কর্ম্মী কালক্রমে মহান্ কর্ম্মীতে পরিণত হয়।

সহকর্ম্মীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম একটা খুব বড় রকমের যোগ্যতা। এই জিনিষটী থাকিলে উত্তম কর্ম্মীরা অধম কর্ম্মীদের দ্বারাও বড় বড় কাজ করাইয়া লইতে পারে এবং কর্ম্মোদ্যম নিষ্কাম ও নিষ্কলঙ্ক হয়। তোমরা ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের অনুশীলনের বদলে পারস্পরিক প্রেম ও সদ্বিচার অনুশীলন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরি-ওঁ

দোমোহনি

২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঝড়ের গতিতে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিতেছি। মটর বা ট্রেণ হইতে নামিয়াই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইতেছি ভাষণ-মঞ্চে। পূর্ণ দুই ঘণ্টা

কাল ভাষণ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে বসিতেছি কলম লইয়া। শত পত্র জমিয়া যাইতেছে। সবগুলির জবাব দেওয়া সম্ভব করি কি করিয়া? তোমরা কি একস্থানের পত্র দশ স্থানে নকল করিয়া পাঠাইয়া সকলের জ্ঞাতব্য সকলকে জানাইয়া দিতে পার না?

কোনও কোনও স্থানে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত হইতেছে। শরীর তালে থাকিতেছে না এবং দেহের উপরে অন্যায় উৎপীড়ন চাপাইয়া প্রত্যেকটী কর্ত্তব্য কার্য্য কর্ম্মতালিকানুযায়ী করিয়া যাইতে হইতেছে। চিরকাল যথাসময়ে ভাষণ সুরু করিয়াছি, আজ হঠাৎ উদ্যোক্তাদের ত্রুটিতেই ভাষণ সুরু হইতে দেরী হইলে জনসমাজ তাহার জন্য আমাকেই দায়ী করিতেছে। ফলে উদ্যোক্তাদের ত্রুটি আমার রক্তমাংসের উপর দিয়া প্রতিশোধ নিতেছে। কি যে নিদারুণ শ্রম চলিয়াছে, তাহা যদি ধারণা করিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমাদের উপকার হইত।

তোমরা যেই সকল অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছ, সেইগুলির পরিচালনার কার্য্যে কিছু কিছু অর্থের নিশ্চয় আবশ্যকতা আছে। সামান্য সামান্য কাজ তোমরা মণ্ডলীর অর্থভাণ্ডারের রিক্ততার দরুণ করিয়া উঠিতে পার না। সুতরাং নিজ নিজ স্থানের মণ্ডলীর কাজ সুচারু রূপে পরিচালনের জন্য তোমরা প্রত্যেকে কিছু কিছু আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিবে, ইহা ত' একান্তই সঙ্গত। কিন্তু তোমরা তাহাতে পীড়া বোধ কর। তোমরা মনে করিয়া বসিয়া আছ যে, এই ত্যাগটুকুতে যাহারা তোমাদের বাধ্য করিতে চাহে, তাহারা তোমাদের আর্থিক দুরবস্থার বিষয় সম্যক অবগত নহে। একটী কথাই তোমরা

আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পার নাই যে, তোমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর আয়ব্যয়ের সহিত অযাচক আশ্রমের কোনও সম্পর্ক নাই। অন্যান্য বহু আশ্রমের সহিত অযাচক আশ্রমের ইহাই এক বিরাট পার্থক্য যে, জনসাধারণের কাজ হইতে অযাচক আশ্রম কিছুই ত' চাহেন না, তোমরা যাহারা আমার মন্ত্রশিষ্য, তাহাদের নিকটেও না। আমি অযাচক আশ্রম এমন শক্ত বনিয়াদের উপরেই গড়িয়া তুলিয়াছি, যাহা বাহিরের অর্থসাহায্য ব্যতীতই চিরকাল জনসেবা করিয়া যাইবার প্রয়াস পাইবে। তোমাদের মধ্যে পরস্পরের যে মাঝে মাঝে আর্থিক সহযোগের আহ্বান আসে, তাহা ত' নিতান্তই স্থানীয় কার্য্যগুলি সম্পাদনের জন্য। তাহাতে যদি তোমরা নিজেদিগকে উৎপীড়িত মনে কর, তবে আমার মনে হয়, তোমাদের মণ্ডলী হইতে ব্যয়সাধ্য কাজগুলির পরিকল্পনাও তুলিয়া দিতে হইবে। একজন দুইজন অর্থবান্ ব্যক্তির আর্থিক ত্যাগে একটা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভব হইতে পারে না। ইহা সঙ্গতও নহে। তোমাদের স্থানীয় ব্যাপার তোমরা বুঝিবে না, দূর হইতে আমাকে সেই বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন আসিবে, ইহা খুব প্রশংসার কথা নহে।

মণ্ডলীর ব্যয়সঙ্কোচ করিবার জন্য তোমরা নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিও। প্রয়োজন হইলে সমবেত উপাসনাতে ভোগ-নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি বরং বর্জ্জন করিও। ফুল-বেলপাতায় টাকাকড়ি লাগে না। ভোগ-নৈবেদ্যে লাগে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলিতে খিচুড়ির মহোৎসব বন্ধ রাখিও। সভা-সমিতি, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, নগর-পরিক্রমা

ইত্যাদিতে পয়সা কম লাগে, খিচুড়ীতে বিপুল ব্যয় হয়। নিজেদের উৎসবাদির তারিখ নিকটবর্ত্তী অন্যান্য মণ্ডলীর তারিখ হইতে আলাদা রাখিবে, তাহা হইলেই বিনা ব্যয়ে তাহাদের উৎসব-মঞ্চ-সজ্জার অনেক উপকরণ তোমরা আনিয়া নিজেদের উৎসব-সময়ে ব্যবহার করিতে পারিবে।

এইভাবে তোমরা ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে তোমাদের মণ্ডলীর কার্য্যাদি-পরিচালনের জন্য আবশ্যকীয় অর্থের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

ত্যাগ ছাড়া কখনো মানুষ বড় হয় নাই। সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানও তাহার ত্যাগ-সামর্থ্যের দ্বারাই সার্থক হইয়াছে। তোমাদের প্রতিজনের জীবনে স্বার্থের সেবা ষোল আনাই চলিয়াছে কিনা, তাহা নিয়া কেহ গবেষণা করে নাই। কিন্তু ত্যাগ তোমাদের কাহার কতটুকু তাহার হিসাব লইবার প্রয়োজন আছে। সত্য বস্তুতে নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা তোমাদের এক কথায় টলে, এক কথায় তোমাদের প্রগাঢ় ভক্তি গলিয়া জল হয়, তারপরে হয় কাদা, তারপরে হয় কৃমিকীটের আবাস-স্থল নিদারুণ পূতিগন্ধময় অমেধ্য অসুন্দর বস্তুতে পরিণত। বল, ইহার হিসাব লইবার প্রয়োজন আছে কিনা?

তুমি তোমার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে থাকিয়াই কতজনের জন্য কত কাজ করিতে পার। কর নাই। তুমি তোমার ক্ষুদ্র সাধ্যের মধ্যেই অনেক আদর্শ স্থাপন করিতে পার। তাহার প্রয়াস পাও নাই। বল, তোমার সহিত পত্রালাপ করিয়া, দিস্তায় দিস্তায় কাগজ লিখিয়া আমি সত্য সত্য সমাজসেবা কতটুকু করিব? জাগিয়া যে ঘুমাইবে, তাহার

ঘুম কে ভাঙ্গিবে? সব বোঝ, কিন্তু তবু বুঝিতে চাহ না।

কিন্তু তাই বলিয়া আমার প্রেম তোমাদের পরিত্যাগ করে নাই, ইহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরি-ওঁ ধর্ম্মপুর-বাকালি (জলপাইগুড়ি)
২৯শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল ধর্ম্মপুরের ভাষণ প্রবল বারিবর্ষণের মধ্যে দিতে হইয়াছে। সমাগত সজ্জনেরা শুনিতেই চাহেন, বাড়ী যাইতে প্রস্তুত নন, আমিই বা বলিয়া যাইব না কেন? বর্ষার বারিধারার আওয়াজ ঢাকিয়া দিয়া লাইড-স্পীকারের গর্জ্জন চলিতে লাগিল। বলিলাম, আজ তোমরা প্রবল বারিবর্ষণের মধ্যে যেমন করিয়া স্থির হইয়া প্রতিটি কথা শুনিয়া যাইতেছ, একদিন প্রয়োজন হইলে এমনি করিয়া প্রবল অগ্নি-বর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়াও আমি বলিব এবং তোমরা শুনিবে। ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য পৃথিবীবাসীর দুঃখবিমোচনের জন্য, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার প্রতীকারের জন্য, পাপ ও উৎপীড়নের প্রতিরোধের জন্য সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেম-সহকারে আমাদিগকে বর্ষার বারিধারাও সহিতে হইবে, অগ্নিগোলকের আঘাতও সহিতে হইবে। ধর্ম্ম হইতেছে তাহা, যাহা আমাকে বিশ্বের প্রতিজনের সহিত ধরিয়া রাখে, তোমাকে

আমাকে সকলকে সকলের সহিত বাঁধিয়া রাখে, জীবে জীবে ঐক্যবদ্ধতা, প্রেম ও প্রীতি সৃষ্টি করিয়া রচনা করে মিলনের নিবিড় উল্লাস।

সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। কাপড়, কৌপীন, জামা, জুতা কিছুই অপরিসিক্ত ছিল না। সভাস্থলেই তাহা বদল করিয়া নিয়া আবার ভাষণ সুরু করিলাম। জামা, কাপড় বদল করিবার সময়টুকু মালবাজারের সাংবাদিক শ্রীমান্ রবিশঙ্কর ঘোষ জনসাধারণকে এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রাখেন। জামা ছাড়িলাম, কাপড় ছাড়িলাম, আবার ভাষণ সুরু হইল। মাথার উপর দিয়া মূষলধারে বৃষ্টি প্রায় ত্রিশ মিনিট কাল চলিয়াছিল। ভাষণ আড়াই ঘণ্টা হইয়াছে।

এইভাবে স্থানের পর স্থান ঘুরিতেছি কেন জান? প্রেমের তাড়নায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যাহাদের ভালবাসিয়াছি, তাহাদের জন্য প্রাণও দিতে পারি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরি-ওঁ

ধর্ম্মপুর-বাকালি (জলপাইগুড়ি)

২৯শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবাসকল ও মায়েরা, তোমরা আগরতলা হইতে আঠারো জন মহিলা ও সাঁইত্রিশ জন পুরুষ কর্ম্মী মধুপুর আশ্রমে

গিয়াছিলে শ্রমদান করিতে এবং তারাভূষণের মা সপ্তিতিবর্ষীয়া লাবণ্যপ্রভা রায় নিজ হাতেই একাকী একখানা বেগুন ক্ষেত নিড়াইয়া দিয়াছিলেন, এই সকল সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তারাভূষণ প্রতি বৎসর দশ হাজার শ্রমিককে কাজ দেয়। তাহার মাতা এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা হইতে হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিতে করিতে ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া মধুপুর আশ্রমে গিয়া পুণ্যবুদ্ধিতে আশ্রমের বেগুন ক্ষেত নিড়াইবার জন্য সেখানে সারাটি দিন পরিশ্রম করিলেন, এই সকল কথা শুনিলেও পুণ্য। তোমরা একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে সুরু করিলে। সপ্তাহে সপ্তাহে এই কাজ তোমরা করিয়া যাইবে বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা যেন তোমাদের অটুট থাকে।

সৎকাজের অল্পও ভাল। করিব ত' করিব, ভাল করিয়াই করিব, এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত লোকও অনেক আছে। কিন্তু ভাল করিয়া করিবার সুযোগ জীবনে বহুবার আসে না। অল্প অল্প করিয়া সৎকাজ করিবার সুযোগ তোমার নিকটে প্রতিদিন আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তুমি শুধু সেই সুযোগকে গ্রহণ করিলেই হয়। মন হইতে অহমিকা দূর করিতে পারিলে আর প্রতিদিন যে যতটুকু ক্ষুদ্র সুযোগ পায়, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র প্রয়াসের মিলিত ফল এক বিরাট পরিণতি লাভ করে। এই কথা প্রতিজনে স্মরণ রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯)

শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)
হরি-ওঁ
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শিলিগুড়ি পদার্পণ করিয়াই এক নূতন সংবাদ শুনিলাম। কোনও এক সুপ্রতিষ্ঠিত মঠের অনুবর্ত্তিগণ প্রচার করিতেছেন যে, আমি নাকি সেই মঠের অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী। সুকৌশলে একদল নিরীহ নির্ব্বেলিক সহজবিশ্বাসপরায়ণ সজ্জনের মনে আমাদের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করিয়া দিবার বেশ সযত্ন প্রয়াস চলিতেছে। যাঁহারা সৎ, সাধু ও জনকল্যাণকারী, যাঁহারা পরোপকারী, ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয় সাধক, যাঁহারা আদর্শপ্রচারের দ্বারা ও লোকহিতপ্রচেষ্টার মধ্যবর্ত্তিতায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া জনসমাজের শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন, আমি যে তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী শত্রু, এই কথাটা প্রচারের দ্বারা আমার প্রতি লোকের অযথা বিদ্বেষ ও বিরক্তি সৃজনের চেষ্টা একটা চমৎকার কৌশল সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমি যে নিজের কাজ নিয়াই ব্যস্ত। অন্য সঙ্ঘ বা মঠের বিরুদ্ধতা করিবার আমার অবকাশ কোথায়? আর, আমার জীবনাদর্শই হইতেছে, Live and let live, নিজেও কাজ করিয়া যাও, অন্যকেও তাঁদের কাজ করিতে দাও। যাঁহারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের সেবা দিয়া মানব-সমাজের কুশল সম্পাদনে চেষ্টিত রহিয়াছেন,

তাঁহারা ত' আমাদের নমস্য। যে কাজ আমি করিতে পারিতাম না বা যেখানে যাইয়া কাজ করিবার আমার অবসর নাই, এমন জায়গায় ইঁহারা গিয়া সেই কাজগুলি করিতেছেন। ইঁহাদের কাজ আমার পরমোদ্দেশ্য সাধনের অনুপূরক বা সম্পূরক। এই কারণে ইঁহারা আমার ধন্যবদার্হ। ইঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখিবার আমার অবকাশ কোথায়? ইঁহাদের বিরুদ্ধতা করিবার আমার প্রয়োজন কি?

তথাপি এই জাতীয় অপবাদ সৃষ্টি করা হইতেছে। কেন হইতেছে, ধারণা করিতে পার? হয়ত ইঁহারা মনে করেন যে, জগতের যত লোক, সকলেই ইঁহাদেরই মতানুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য। হয়ত ইঁহারা অতি গোপনে মনে মনে বিশ্বাস করেন যে, ইঁহারা যাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছেন, সেই একজনকে অবতার বলিয়া স্বীকার না করিলে জগতের লোক নরকে পচিবে। হয়ত ইহারা ভাবেন, ইঁহাদের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শনের জন্যই জগতের সকল মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। আদর্শবাদী মহাপুরুষগণের পবিত্র পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া যেই মঙ্গলময় সেবার পথে ইঁহারা নামিয়াছিলেন, জনতার দ্বিধাহীন অনুসরণের ফলে সেই পথের মাটি ধূলি এবং পঙ্কে পরিণত হইয়া ইহাদের মনকে হয়ত আচ্ছন্ন ও মলিন করিয়াছে। জনতা দিয়াছে জয়ধ্বনি আর করিয়াছে আনন্দে লম্ফঝম্প দান, পথের শক্ত মাটি তাহাতে ধূলি হইয়া আকাশে উড়িয়াছে। জনতা করিয়াছে মঙ্গল-কলসীর জল ঢালিয়া ইঁহাদিগকে অকুণ্ঠ অভ্যর্থনা দান

আর তাহাতেই পথের মাটি কাদায় পরিণত হইয়া সৌম-সুন্দর গৈরিকে দিয়াছে পঙ্ক-প্রলেপ। তাই হয়ত ইঁহারা আর দেখিতে পাইতেছেন না যে, জগতে যত জীব আছে, সকলেই স্বয়ম্ভূ শিব, সকলেই ঈশ্বরাবতার, সকলেরই নিজ নিজ বিবেকানুমোদিত পথে চলিবার অধিকার আছে। যে পথ জীব-কল্যাণোদ্দেশে নির্ব্বাচিত, তাহা যদি ইঁহাদের প্রণীত পথ হইতে বিভিন্নও হইয়া থাকে, তবু মানুষ তাহার স্বাধিকার-বলে সেই পথে চলিবে,—এই সত্যটুকুর হয়ত বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। তাই মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অন্য মঠ ও সঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের জন্যই ঘরের কড়ি খরচ করিয়া দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, এমন ধারণা সুস্থ মস্তিষ্কে আসে কি করিয়া? চাঁদা তুলি না, ভিক্ষা সংগ্রহ করি না, দু-দশ টাকার বহি বিক্রয় হইলে তাহা দিয়া নিজেদের দুরন্ত ভ্রমণের অফুরন্ত ব্যয় মিটাইবার চেষ্টা করি, এক একটী কপর্দ্দক ব্যয়ের কালে অনুভব করিতে বাধ্য হই যে হৃৎপিণ্ডের কয় বিন্দু রক্তের বিনিময়ে এই একটী কপর্দ্দক অযাচক-বৃত্তির মধ্য দিয়া আসিয়াছিল। আশ্চর্য্যই ত'! এমতাবস্থায় অন্য সঙ্ঘ বা অন্য মঠের বিরুদ্ধ প্রচার ছাড়া আমাদের আর কি কোনও মহনীয় কাজ থাকিতে পারে?

আজিকার সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক মঠ-মন্দির-আশ্রমই ভাবীকালে থাকিবে না। বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজগৃহের বিহারগুলি আজ কোথায়?

শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত চারিটী বিখ্যাত মঠের আজ হাল কি? অশোক-হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য অল্পকালে ক্ষয় পাইয়াছে, বড় বড় মহাপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দির আস্তে আস্তে রূপান্তর ও অবস্থান্তর পাইয়া জীর্ণ, শীর্ণ ও অবলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। আচার্য্য শঙ্করের যে প্রভাব ছিল, আজ কি গোবর্দ্ধন, যোশী, সারদা বা শৃঙ্গেরী মঠ ভারতীয় জীবনের উপরে সেই প্রভাবের শতাংশ দাবী করিতে পারেন? অবৌদ্ধেরা আজ ঘরের টেবিলের উপরে বুদ্ধমূর্ত্তি সাজাইয়া বসাইতেছে কিন্তু যেই ভারতের প্রতি প্রান্তে বুদ্ধশাসনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রসার হইয়াছিল, সেই ভারতে বৌদ্ধ আজ সত্য সত্য কয়জন? আদর্শই বাঁচিয়া থাকে, আদর্শই কালজয়ী, সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠান বা মঠ নহে। বেদান্তবিদ্ মহান পুরুষেরাও যদি এই সত্য বিস্মৃত হইয়া যান্, তবে সাধারণ লোকের অবস্থা কি হইবে?

শিলিগুড়িতে যাহা শুনিলাম, ইহার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক স্থানেই ইহা শুনিয়াছি। কিন্তু ইহাতে আমি বিরক্ত হই নাই। রাম যদি গাহিয়া বেড়ায় যে, আমি রামের বিদ্বেষী এবং শ্যাম, যদু, মধু তাহা বিশ্বাস করিয়া যদি আমাকে ঘৃণা করিতে সুরু করে, তাহা হইলে ক্ষতির দিক দিয়া আমার মাত্র এই যে, শ্যাম, যদু, মধু আমার কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া আমার সেবা গ্রহণে আগ্রহী হইবে না। কিন্তু লাভের দিক দিয়াও একটা হিসাব আছে। একদিন অবশ্যই ইহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, অন্য সঙ্ঘ, মঠ বা আশ্রমের প্রতি বিদ্বেষ আমার কাজ

নয়, আমার কাজ সকলকে সমভাবে প্রেম দেওয়া। সত্য চিরকাল অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। অপপ্রচারের ছাই দিয়া ঢাকা সত্যের আগুন একদিন নিজের উত্তাপ ও লালিমা প্রকাশ করিবেই। তখন এই শ্যাম, যদু, মধুই হইবে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত সহকর্ম্মী। মুখে অসাম্প্রদায়িকতার বাণী প্রচার করিলেও অনেক নামজাদা মঠ ও আশ্রমকে কার্য্যতঃ এই বিশ্বাসই পোষণ করিতে দেখা যায় যে, জগতের সকল অরণ্যে একমাত্র শালবৃক্ষই থাকিবে, নাগেশ্বর, শিশু, গাম্ভারী, সেগুন থাকিতে পারিবে না। কিন্তু জগতের লোকের প্রয়োজন বড় বিচিত্র। সুতরাং শত শত জনের শত শত প্রকারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আয়োজনও থাকিবে শত শত। বিভিন্ন মঠ, আশ্রম, সঙ্ঘের উত্থান, বিকাশ ও প্রসার যাহারা সহ্য করিতে পারিবে না, তাহাদের আর যেই বিশেষণেই বিশেষিত করা হউক, উদার ও সমদর্শী বলা চলিবে না।

তোমরা উদার ও সমদর্শী হইয়া চলিও। ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলিয়া প্রচার তোমাদের যেন কখনও লক্ষ্য না হয়। অবতার তোমরা প্রত্যেকে। অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছ বলিয়া নিজেদের চিনিতে পারিতেছ না। তোমরা ভগবানের কাছ হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমাদের ভিতরে ভগবানেরই শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ত্যাগ-তপস্যার মধ্য দিয়া মানুষের সন্তানেরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে অবতার হইয়াছেন, সেই ত্যাগ-তপস্যার অনুশীলন হইলে তোমরাও অবতার বলিয়া নিজেদের

জানিতে পারিবে। মনে করিও না যে, অবতার একটা আলাদা জীব। জীবই আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা শিব হয়। অবতার যদি আলাদা জীব হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা মাতৃরজ পিতৃবীর্য্যের সহায়তা নিয়া মানুষী তনু ধারণ করিতেন না। পরমেশ্বর তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়া একটী ধূলি-কণাতেও বিদ্যমান আছেন। যিনি বিশ্বব্যাপী, যিনি কোটি বিশ্বকে নিজের ভিতরে ধরিয়া রাখিয়াই ইহার অতিরিক্ত, তিনি আবার তাঁহার পূর্ণ সত্তায় একটী পরমাণুর ভিতরেও অবস্থান করিতে পারেন। ইহা এক বিস্ময়কর কবিত্ব, কিন্তু ইহা একটী চরম দার্শনিক সত্য। ভগবান্ অবতার হইতে পারেন এবং তিনি তোমার মধ্য দিয়াও তাঁহার অবতারত্ব প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যুগে যুগে তিনি অবতার হইয়াছেন, ভূভার-হরণ করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর দূরিত-রাশি সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই। তাই তিনি নিত্য-নূতন অবতার-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। তিনি তোমার ভিতর দিয়াও তাঁহার সেই ঐশী প্রকাশেচ্ছাকে রূপ দিতে পারেন। তুমি নিজেও সামান্য মানব নহ।

আমরা প্রচার করিব মানুষের এই সর্ব্বজনীন অবারিত সম্ভাবনার কথা। আমরা প্রত্যেকটী জীবাত্মার শিবত্ব বিকাশের করিব বিজয়-ঘোষণা। আমরা অবজ্ঞাতের মধ্যে ব্রহ্মকে সুপরিজ্ঞাত দেখিব। আমরা হতাশ, অবশ, অনাত্মস্থ, দুর্ব্বল মানবের মনে ব্রহ্মবিজয়ের বার্ত্তা করাইব অনুপ্রবিষ্ট। আমাদের কাজ বিশ্বের প্রতি মানবের সহিত

বিশ্বাত্মার পরিপূর্ণ ঐক্যের সুপ্রতিষ্ঠা। বিশ্বকে ব্রহ্মময় এবং ব্রহ্মকে বিশ্বময় দেখিবার ও দেখাইবার সাধনা নিয়াই আমরা আসিয়াছি। ইহা অপেক্ষা এক কণা ছোট কোনও কাজে আমরা নিজেদিগকে লিপ্ত করিতে পারি না। ইহা তোমরা প্রতিজনে মনে রাখিও।

কাল শিলিগুড়ি ষ্টেশনে একটা জনাকীর্ণ অভ্যর্থনা গিয়াছে। পুষ্প-মাল্য আর ফুলের তোড়া জামা-কাপড়ে রং ধরাইয়া দিয়াছে। তারপরে চলিয়াছে সারারাত্রি প্রবল বারিবর্ষণ। অদ্যও তাহা চলিয়াছে। বিকালে ভাষণ হইতে পারিবে কিনা জানিনা। আকাশে বড়ই ঘনঘটা। তবে বৃষ্টির দরুণ দর্শনার্থীর ভিড় নাই। অনেক দিনের স্তূপীকৃত চিঠির জবাব দিবার একটা সুযোগ সত্য সত্য আজ পাইয়াছি, এজন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এবারকার মত জলপাইগুড়ি জেলার ভ্রমণ আমার শেষ হইয়া গেল। মনে হয় ময়নাগুড়ি, উদলবাড়ী, ফলাকাটা, শামুকতলা ও সদর সহর জলপাইগুড়ি ছাড়া সাধারণ ভাবে আমরা সমস্তটা জেলার

মধ্যেই কাজ করিয়াছি। ঝড়ের গতিতে ছুটিয়াছি, নাওয়া-খাওয়ার দিকেও তাকাইতে পারি নাই এবং ভাষণও দিয়াছি প্রায় ঝড়েরই গতিতে। আমরা ত্বরিত কাজ করিতে চাহিলে কি হয়, লোকে ত' অত ত্বরিত কথা বুঝিতে পারে না। তাই, আমরা যাহা বলিয়াছি কহিয়াছি, তাহা অনেক স্থানে লোকের বোধগম্য হইয়াছে আমরা চলিয়া যাইবার দুই তিন দিন পরে। আমরা যে চাঁদা সংগ্রহের জন্য যাই নাই, দীক্ষাদান যে আমাদের আসল কার্য্য নয়, দীক্ষাব্যাপারটাকে আমরা যে অর্থোপার্জ্জনের উপায় রূপে গ্রহণ করি নাই, কোনও নির্দ্দিষ্ট মত বা পথকে নিরস্ত বা পর্যুদস্ত করিবার জন্য যে আমাদের এই ক্লেশকর দেশ-পর্য্যটন নহে, ইহা প্রায় সকল স্থানের লোকেই বুঝিয়াছেন আমরা চলিয়া আসিবার ঢের পরে।

সুতরাং তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আমাদের কথা বুঝিবার জন্য লোককে তোমাদের আগে হইতেই তৈরী করা প্রয়োজন। সমদীক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য নহে, গুরুদেবের মঠে চাঁদাদাতার সংখ্যাপুষ্টির জন্য নহে, তোমাদের গুরুকে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে অবতার রূপে পূজা করিবার প্রথা প্রচলনের জন্য নহে, মানুষের সহিত মানুষের সহজ সম্বন্ধ যে ভ্রাতৃত্বের এবং এক মানুষের প্রতি অপর মানুষের কর্ত্তব্য যে সাম্প্রদায়িক-ভাব-নিরপেক্ষ, এই কথাটুকু সকলের বোধগম্য করিবার জন্যই তোমাদের প্রচার ও সংগঠনে শ্রম-স্বীকার প্রয়োজন। এক মানুষের সহিত অপর মানুষকে ধরিয়া রাখে যে মহাবস্তু, তাহার নাম ধর্ম্ম। প্রেম এই ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। এক সমাজের সহিত অপর সমাজকেও ধরিয়া রাখে প্রেম। এক জাতির সহিত অপর জাতিকেও

ধরিয়া রাখে প্রেম। ধরিয়া রাখে বলিয়াই প্রেম ধর্ম্ম। নতুবা ইহা অধর্ম্ম হইত। সকলের সহিত সকলকে ধরিয়া রাখিবার জন্যই ধর্ম্মের প্রকাশ। মানুষের সহিত মানুষের প্রেম ও মৈত্রী সৃষ্টি করাই তোমাদের তপস্যা। এই কথাটুকু মনে রাখিয়া তোমরা তোমাদের পরিচয়ের পরিধি-বিস্তার করিও। কে কোন্ মঠ বা আশ্রমের শিষ্য, কে কোন্ মহান্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অনুবর্ত্তী, এই সকল মঠ বা আশ্রমের মধ্যে দার্শনিক মতবাদের বা কর্ম্মনীতিগত পার্থক্য কি কি আছে, এই সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে কোথায় কোথায় রহিয়াছে মিলের অভাব,—এই সকল বিষয় তোমার বিবেচ্য নহে। মানুষকে মানুষ বলিয়াই তুমি চিনিয়া লও, মানুষ বলিয়াই তাহাকে সমাদর কর, মানুষ বলিয়াই তাহাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন কর, মানুষ রূপেই তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধর। মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য করিয়াই তুমি মহান্, মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসিয়াই তুমি সার্থকজন্মা। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের হলাহল যাহারা সৃষ্টি করিয়াছে, মানুষরূপী নীলকণ্ঠ তাহাদের অন্তরের কালকূট অম্লান বদনে পান করিয়া জীব-কুলকে নিস্তার দিবে।

আমরা গাহিব আজ মানুষের জয়গান,
আমার রচিব আজ মানুষের মহিমা,
মানুষের লাগি যত মানুষেরা দিবে প্রাণ,
রাখিবে কীর্ত্তি যত অপারা ও অসীমা।। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরি-ওঁ শিলিগুড়ি
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া কাজে নামিয়াছ। আবার তোমরা সন্ন্যাসীর শিষ্য। কাজে তোমাদের অর্থের বিপুল প্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করি কিন্তু কে কি অর্থ সাহায্য করিল বা না করিল, সেই দিকে তাকাইও না। অল্প অর্থে কত বেশী কাজ করা যায়, তার দিকে তাকাইয়া চল। লক্ষ্য স্থির থাকিলেও সতর্কতা থাকিলে অল্প অর্থ ব্যয়ে অনেক সময়ে অনেক অধিক কাজ করা যায়। বাহিরের চাল বাড়াইতে গিয়াই ত' অধিকাংশ সময়ে অর্থের অত্যধিক অপচয় করা হইয়া থাকে। চালবাজ লোকেরা আসল কাজকে ফেলিয়া রাখিয়া বাজে কাজগুলিতে অধিক জৌলুষ চড়াইবার চেষ্টায় থাকে। তাহারা মনে করে যে, আসল কাজ যাহাই হউক, বাহিরের চটক দেখিয়া যেন জন-সাধারণ ভড়কাইয়া যায়, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের যেন চক্ষু ধাঁধিয়া যায়। অনেক সময়ে চালবাজ লোকদের এই চালাকী বাইরের নামযশ বৃদ্ধিতে সহায়তাও করে। খবরের কাগজে অধিকাংশ সময়েই প্রকৃত কর্ম্মীদের কাজের বিবরণ আদৌ প্রকাশিত হয় না আর হইলেও দুই এক পংক্তিতেই তাহার সমাপ্তি হয়। পরন্তু শূন্যগর্ভ বাহ্যাড়ম্বর অনেক সময়ে সংবাদপত্রের হেড-লাইন সমূহ

অধিকার করিয়া থাকে। একথা প্রায় সত্য বলিয়া মনে করিতে পারি। তোমরা বাজে বাহ্য ভড়ং বর্জ্জন করিবে। আসল কাজের দিকেই লক্ষ্য রাখিবে। তাহা হইলেই অর্থের বিপুল প্রয়োজনীয়তা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে।

সৎকাজে নামিলে অযাচিত অর্থসাহায্য কিছু কিছু আসে। কে বেশী দিল, কে কম দিল, তাহা নিয়া কখনও আলোচনা করিবে না। এবং কেহ কম দিয়া থাকিলে তাহাকে হেয় এবং কেহ বেশী দিয়া থাকিলে তাহাকে প্রেয় জ্ঞান করিবে না। বড় বড় চাঁদাদাতাদের জন্য বড় পীড়ি আর অল্প দাতাদের জন্য বাঁশের লগি দিবে না। ছোট-বড় সকল সহযোগীদেরই প্রতি সমান সমাদর দেখাইতে চেষ্টা করিবে। সৎকার্য্যের জন্য অর্থসাহায্যই সব চেয়ে বড় কথা নহে, সৎকাজে অন্য শতরূপ সহায়তা লোকে দিতে পারেন এবং তাহাও অর্থ-সাহায্য অপেক্ষা কৌলীন্যে ন্যূন নহে। সৎকার্য্যে উৎসাহ, অভয় ও প্রসন্ন মনের অমিত শ্রম দান করাও তুচ্ছ কথা নহে।

যেখানেই যে অনুষ্ঠান কর, জন-সাধারণের নিকটে তোমাদের আর্থিক প্রার্থনা কিছু না থাকিলেও তাঁহাদের সহিত পূর্ণ যোগাযোগ রাখিবে। বুদ্ধি-পরামর্শ নিবার জন্য তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের নিকট অবশ্য যাইবে এবং তাঁহাদের নিয়া পরামর্শ-সভা করিবে। যেখানে দশটী মাথা একত্র হয়, ব্রহ্মার জ্ঞান ও বৃহস্পতির বুদ্ধি সেখানে স্ফূর্ত্ত হয়। শুদ্ধ মন নিয়া দশ জনে মিলিলে তাঁহাদের পরামর্শে অশেষ

সুফল ফলিয়া থাকে। তোমাদের কোনও অনুষ্ঠানই তোমাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান নহে। তোমাদের প্রতিটি কার্য্য জগতের সর্ব্বজনের নিঃশ্রেয়স কুশলের জন্য। তাই সকলকে ইহাতে ডাকিবে, ইহাই ত' স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কূটবুদ্ধি লোক যদি কেহ থাকেন, যিনি তোমাদের কাজ পণ্ড করিয়া দিবার ফিকিরে রহিয়াছেন, তাহা হইলে গুরুতর কোনও দায়িত্ব বা অধিকার তাঁহার উপরে ন্যস্ত করিবে না।

তোমাদের সদুদ্দেশ্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা শুনাইয়া জনসাধারণের মনকে তোমাদের প্রতি বিরূপ করিবার চেষ্টা যদি কোনও ব্যক্তি বা সঙ্ঘ করিতে থাকে, তবে তোমরা তাহাকে মোটেই মূল্য দিবে না। অপবাদ-প্রচারকারীদের আসল মূলধন অসত্য। তাহারা দীর্ঘদিন সত্য প্রয়াসের সহিত সংগ্রাম চালাইতে সক্ষম হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। আর তাহাদের সহিত সংগ্রাম চালাইবার হাতিয়ার তাহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা-উদ্‌গীরণ নহে, তোমাদের আদর্শকে ঘরে ঘরে বিতরণ করাই তোমাদের প্রকৃষ্ট প্রহরণ। কে কি মিথ্যা বলিয়াছে, কে কি অসত্য সৃষ্টি করিয়াছে, কাহার রটনায় কতখানি কল্পনার উদ্দাম লীলা চলিয়াছে, তাহা নিয়া গবেষণা করিয়া নিরর্থক সময় নষ্ট করিও না। বিরুদ্ধপ্রচারকারীরা কত অপরিচিতের সহিত তোমাদের পরিচয়-বন্ধন সৃষ্টির হেতু নির্ম্মাণ করিতেছে, আজ তাহা তোমরা কল্পনাও করিতে পার না। সুতরাং ইহাদের প্রতি তোমাদের ভাব হউক প্রেমময়। ইহারা পথভ্রান্ত হইলেও তোমাদের ভাই, শত্রু নহে।

তবে নিজ লক্ষ্যে সুস্থির থাকিতে হইবে। নিজের কাজ আদায় করিয়া নিতে হইবে। বিরুদ্ধপ্রচারকারীদের সহিত সংগ্রাম করিবে না বলিয়াই যে তোমাদের কাজটুকুকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দিবে, তাহা নহে। নিজের কাজ পূরা দমে বাজাইয়া বিজয়বিক্রমে বীর দর্পে চলিতে থাক। কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া পৌরুষকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার কোনও অর্থ নাই। প্রেম রাখিয়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়। প্রেমিক কোনও অবস্থাতেই অন্তরের অফুরন্ত ভালবাসাকে দূর করিয়া দেয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত)